Adhunik Kavita

প্রকাশক :
গণেশ বসু
৩১/২, হরিতকীবাগান লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী : চারু খান

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীজানকী নাথ পাল
নিউ শ্রীমা প্রেস
২, ঈশ্বর মিল বাই লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

স্মৃতিলাঞ্ছন শব্দ দিয়ে গড়ে তোলা হয় কবিতা। সব চেয়ে পুরনো অথচ চির নতুন সমমাত্রিক এই শিল্পআঙ্গিকটি সব সময়েই যোগ্যতর হাতে মহত্তম উপলব্ধির বাহন হয়ে উঠেছে। সমর্থ কবিপ্রতিভা বিচ্ছিন্নতা উত্তীর্ণ করে কবিতায় আনে স্বাধীনতার স্বাদ। পাঠককে দেয় বিশ্বকে মানুষের জন্য যোগ্যতর করে গড়ে তোলার বোধ। সে বোধ পাঠককে সক্রিয় করে তোলে। 'শুদ্ধতা' যখন ভেকমাত্র নয়, কবির মুখচ্ছদ মাত্রও নয়, বরং শিল্প-স্রষ্টার বিশুদ্ধ জাগতিক ঐক্যঅন্বেষার দ্যোতক, তখন শুদ্ধতাও বিপ্লবে অংশ নিতে পারে। তবে আমাদের পৃথিবীতে সে পরিবেশের বদল ঘটে গেছে। বরং পুঁজিবাদী বিকাশের শেষতম স্তরে বিচ্ছিন্নতা দিয়ে কবিতাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে কবিতার দাবিকেই আমরা মেরে ফেলতে চলেছি। কবির ব্যক্তিত্ব, নৈর্ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রসঙ্গ কবিতা-আলোচনায় ঘুরে ফিরে এলেও তথাকথিত ক্লোজড রিডিং-এর রীতিসর্বস্বতায় শেষ পর্যন্ত কবিকেই ভুলে যাই আমরা। কবির পরাজয়কেই বাধ্যতামূলক ভাবে স্বীকার করে নিচ্ছি যেন। আর তাই, আধুনিক বাংলা কবিতার কবি, সমালোচক ও পাঠকদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা কবি-চরিত্রে এবং কবিতায়, নীৎসে-কথিত ডাইনোসীয় উৎকেন্দ্রিকতা যেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমি অবশ্য কবি বলতে সব সময়েই যথার্থ অর্থে এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্বস্বরূপকে বুঝেছি—যিনি প্রকৃতি, সমাজ, শ্রেণী ও ব্যক্তিসত্তার অন্তঃসার ধরার জন্য সবসময়েই অক্লান্ত। আর তাঁর প্রকাশের মধ্যে থাকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য অভিযান। এইসব ও অন্যান্য বক্তব্য নিয়েই প্রবন্ধগুলি লেখা।

আধুনিক কবিতার মুখ্য ব্যাপার ছাড়াও দু-একটি অন্য বিষয়ের প্রবন্ধ বইটিতে আছে। যেমন, বিজ্ঞানবিপ্লবের যুগে কবিতা ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে। আমি দেখাতে চেয়েছি বিজ্ঞানের ভাষা এবং কবিতার ভাষায় মৌলিক তফাত নেই। উভয় ভাষাই রূপকময়। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা এলিজাবেথ সীওয়েলের 'দ অর্ফিক ভয়েস' আমাকে বিশেষ উপকৃত করেছে। কবিতায় নৈর্ব্যক্তিকতা আলোচনায় জর্জ টি. রাইট-এর 'পোয়েট ইন দ পোয়েম'-এর বিস্তৃত সাহায্য নিয়েছি। কাব্যনাট্য আলোচনায় শ্রীযুক্তা মড বডকিনের আর্কাইক চরিত্র

সম্পর্কে মতামত আমাকে সাহায্য করেছে। আই. পি. পাভলব, সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, কার্ল য়ুং, খৃস্টোফার কডওয়েল, গিলবার্ট মারে, জর্জ টমসন, সিডনি ফিঙ্গেলস্টাইন, আর্কিবল্ড ম্যাকলীস, রজার গারোদি, আর্ণস্ট ফিসার, গিওর্গি লুকাচ, হারবার্ট রীড, এলিঅট, পাউণ্ড, লুই আরাগঁ, ওয়ালেস স্টিভেনস, জন কার্ডি, পাবলো নেরুদা, ডরোথি সেয়ার্স, মরিস বাওরা, ক্লেনথ ব্রুকস, মাইকেল হামবুরগার, জঁ। পল সার্ত্রে, আলবের্ত শ্বোইৎসার, হারবার্ট আপথেকার এবং আরও অসংখ্য উত্তমর্ণের ঋণ আমার রচনার বিভিন্ন ছত্রে ছত্রে রয়ে গেছে। কাল মার্কস-এর ১৮৪৪-এর আর্থনীতিক-দার্শনিক পাণ্ডুলিপি অথবা এঙ্গলস-এর ফ্রিডম ও নেসিসিটির মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা আমি রচনাপ্রসঙ্গে কখনই বিস্মৃত হই নি।

১৯৫৮ সাল থেকে নানা সময়ে প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল। কোনো না কোনো পত্রিকার চাহিদা মেটাতে এগুলি লেখা। গ্রন্থপরিচিতিও আছে তার মধ্যে দু-একটি। পুস্তকাকারে গ্রন্থনা করতে গিয়ে অবশ্য কিছু কিছু অদলবদল ঘটেছে, কিন্তু মতামতের বদল হয়নি। তবু পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিই বইয়ের স্বল্প পরিসরের জন্য ছাপতে পারলাম না।

বইখানির নামকরণ করেছেন বন্ধু অশোক ভট্টাচার্য। প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন বন্ধু চারু খান। তাঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই। বইখানির পুরো দায়িত্ব আমারই। এবং তাবৎ নিন্দার দায় একান্ত আমার একারই পাওনা।

তরুণ সান্যাল

সূচীপত্র

রাম বসু

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবেশ রায়

অশোক ভট্টাচার্য

চিত্ত ভট্টাচার্য-কে

গর্কী, আধুনিক বাংলা কবিতা ও ঝড়ের পাখি

কবির হৃদয়ে আর মহাসৃজনের বীণার তারে জীবনের সমস্ত উচ্চারণের ঝঙ্কার ওঠে না, বেজে ওঠে না জীবনের হাসি-অশ্রু আর বিভিন্ন সুরের প্রতিধ্বনি। কবির নিকট থেকে পাওয়া ধারণাগুলির প্রতি মানুষের আগ্রহ স্পষ্টতই ক্রমশ কমে আসছে। কবির কলহাস্য কানেও আসে কদাচিত, আর সে হাস্যধ্বনিও মৃত্যু-মগ্নতায় ক্লান্ত। একদা যা পবিত্র সাহসে অলঙ্কৃত ছিল, অধুনা তা হয়ে উঠেছে হতাশার প্রমত্ততা।

কবি ক্রমশ তথাকথিত পড়াশোনা-করা মানুষ হয়ে উঠছেন—মহত্তর সত্যাচরণের উচ্চ মার্গ থেকে নেমে এসেছেন তিনি ছোট-খাট তুচ্ছ নামধামের জগতে। তাঁর কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী যে কথাগুলির অর্থ,—ধারকরা অপরের সেইসব বোধ নিয়ে, সেগুলি সাজিয়ে তিনি বিবর্ণ ঘটনাগুলি একচক্ষুভাবে রূপায়িত করতে চাইছেন। আঙ্গিক ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর এবং একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে উঠেছে। শব্দপ্রয়োগ হয়ে পড়েছে নিরুত্তাপ থেকে ক্রমোশীতল। বক্তব্যের দারিদ্র্যে তা হতশ্রী। অনুভবের নিষ্ঠা মুছে যাচ্ছে, কোনো উদ্বর্তনের ইঙ্গিতও তাতে অনুপস্থিত। ছিন্নপক্ষ হয়ে ভাবনা নিরুদ্যম দৈনন্দিনের গুহায় নেমে আসছে, টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে, হয়ে উঠেছে নিদ্দাহ, নোংরা আর অসুস্থ। অন্যদিকে নির্ভয় না হয়ে উঠে, কবিতা হচ্ছে নির্বোধ শূন্যতায় হিংস্র ও ধ্বংসাত্মক। ক্রোধ চড়া-গলায় ঈর্ষা আর পরশ্রীকাতর রূপে দেখা দিচ্ছে। ঘৃণা উচ্চগ্রামের ফিস-ফাসে এখন কর্কশ, চতুর্দিকে তার উন্মত্ত দৃষ্টিপাত।…লেখক আর বিশ্বের দর্পণ নন, বরং নিজেরই এক বিচ্ছিন্ন অংশ তিনি। বিভিন্ন অংশের যে ঐক্য একদা সামাজিক নক্সাকে প্রতিবিম্বিত করত, এখন তা ম্লান হয়ে মিলিয়ে যাবার পথে। রাস্তার ধুলোর মধ্যে অবজ্ঞাত ভাবে পড়ে আছে সেই দর্পণের ভাঙা কাচ, আর এইসব বিক্ষিপ্ত টুকরো বিশ্বের জীবনবৈভব প্রতিবিম্বিত করতে অক্ষম; বরং তা প্রতিফলিত করছে রাস্তার জীবনের অকেজো জঞ্জাল আর ধ্বংস হয়ে

যাওয়া আত্মার এলোমেলো খণ্ডাংশ।……এক নতুন ধরনের লেখক আমাদের দেশে দেখা দিয়েছেন—যিনি সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য ভাঁড়, আর ফিলিস্তিনদের রুচিকে একটু সুড়সুড়ি দেবার জন্য যিনি বিদুষক……। মানুষের আত্মমর্যাদা-বোধের পরিমাপক মানদণ্ডের ক্ষেত্রে গ্রাম্যতাদোষ ও অতি-তুচ্ছতার বিরুদ্ধতা হলো অন্যতম। অথচ সমকালীন 'জনমতের নেতা' গ্রাম্যতা-দোষের প্রতি ঘৃণা হারিয়ে ফেলেছেন ; বরং উল্টোদিকে সাহিত্যের মন্দিরে তিনিই গ্রাম্যতার প্রবেশ ঘটিয়েছেন। নিজের নামের প্রতিও তাঁর মানমর্যাদা-বোধ নেই ; সামান্য লজ্জা বা নীতিবোধও বিসর্জন দিয়ে তিনি ভাঁড়, হামবড়া ব্যক্তি, হাতুড়ে আর ভেলকি-খেলোয়াড়দের পাশাপাশি নিজের নাম স্বাক্ষর করেন। দারুণ মুন্সিয়ানায় তিনি লেখেন বটে; শব্দ দিয়ে ভেলকিও দেখান, আর নিজের ঢাক নিজেই বাজাবার দারুণ কৌশল প্রকাশ করেন। অতি মাঝারি আর বুদ্ধিভ্রষ্ট—এই হলো এ ধরনের আধুনিক লেখককুলের প্রধান দুটি ভাগ।…… এসব অশ্লীল ব্যাপার সাহিত্য-রসিকদেরও নাড়া দিয়েছে। এই সাহিত্য এই ক-বছরে এত ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন মানুষকে হতচকিত করে তুলেছে। কিন্তু সবাই তো আর ধুলোই ওড়াচ্ছেন না। (প্রশ্ন হ'তে পারে, তাঁরা কী করছেন?) —এঁরা এখনো তেমন শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ান নি—যে শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালে আমাদের দেশের নারীত্বের উপরে যে নোংরা কাদা ছোঁড়া হচ্ছে, কুমারী, বধূ আর মেয়েদের প্রতি যে অপমান ঘটে চলেছে—তার কোনো প্রতিবিধান হতো।

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি ম্যাকসিম গর্কীর 'ব্যক্তিত্বের ভাঙন' নিবন্ধটি থেকে দেওয়া হয়েছে, আর নিবন্ধটির রচনা কাল উনিশ শো নয় সাল। উদ্ধৃত অংশটি পড়তে পড়তে পাঠকের অবশ্যই মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার কথা মনে না-পড়ে চলতি বাংলা সাহিত্যের কথাই মনে পড়বে। পশ্চিম বঙ্গের কবি ও লেখককুলের এক বিরাট অংশের বিষয়ে সারকথা যেন রচনাটির মধ্যে রয়েছে।

আসলে গর্কী যে-প্রশ্ন নিবন্ধটিতে তুলেছেন, তা হলো সমাজ ও শিল্পীর সম্পর্ক বিচারে মূলধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি ও শিল্পীর সমাজ-বিচ্ছিন্নতা। আমাদের দেশের সাহিত্যের পশ্চাৎপটও যে উদ্ধৃত ঐ প্রায় একই ধরণের

অবস্থার সৃষ্টি করেছে এবং সাহিত্যে যে একই ব্যাধির উপসর্গগুলি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য আমরা এমন কিছু আশা করিনা যে বুর্জোয়া মানসের অধিকারী কোনো শিল্পী সাম্প্রতিক বর্তমানে মহৎশিল্পের স্রষ্টা হতে পারেন। একমাত্র জনসাধারণের মধ্যেকার মূল ধারাগুলি যিনি আত্মস্থ করেছেন শুধু তাঁর পক্ষেই সত্যকার মহৎশিল্প রচনা করা সম্ভবপর। বুর্জোয়া-জগৎ ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে যে আজব ইনডিভিডুয়ালের আগমন ঘটিয়েছে, সেই 'ব্যক্তি' বর্তমানে মানসিকভাবে যেমন বৃহৎ শ্রমজীবী-জীবনের জগত থেকে বিচ্যুত, তেমনি ব্যক্তি-জীবনের সাধারণ ব্যাপার থেকেও দারুন ভাবে বিচ্ছিন্ন। তথাকথিত বুর্জোয়া শিক্ষা ও 'সাংস্কৃতিক দ্রব্য' ভোগ ব্যবস্থা, ব্যক্তির চারিত্র্য গঠনের ক্ষেত্রে সমাজ-চৈতন্যহীন এক ফাঁপা জগতে তাঁকে নিয়ে গেছে। বৃহৎ শ্রমজীবী মানুষের জগৎ এবং স্বদেশী ঐতিহ্য বা আবেগগুলি সম্পর্কে তিনি ক্রমাগত ধারণাহীন হয়ে উঠেছেন। বিশেষভাবে নগরভিত্তিক মধ্যশ্রেণীর নিকটে উপার্জনের পন্থা যখন বুদ্ধিগত শ্রমশক্তির ব্যবহার বা বিক্রয় ছাড়া আর কিছু নয়, তখন দেশের অন্যান্য শ্রেণীগুলি সম্পর্কে বুর্জোয়া ভাবজগৎ যে ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে থাকে, তাঁর মনের প্রস্তুতিও তারই অনুকূলে থাকে। পরিস্থিতির প্রবল আঘাতে তাঁর তাসের ঘর ভেঙে যাবার পরও তিনি তাঁর সেই ঘর নিয়ে হা হুতাশ করে। বুদ্ধি ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বুর্জোয়া সমাজ যে মূল্যবোধ ও মর্যাদাবোধের পার্থক্য ঘটিয়েছে, সেটা-যে সঠিক নয়, আসলে উভয়ের উৎস যে শ্রমই—এ বোধ যতদিনে না জাগ্রত হচ্ছে ততদিন দেশের আপামর মানুষের মনোজগৎ সম্পর্কে তাঁর একধরণের বিরূপতা থেকেই যাবে। আর, যদি সে ব্যক্তি কবি বা শিল্পী হন, তাহলে বিষয়বস্তু নয়, লিপিচাতুর্যের মাধ্যমে নিজের বুদ্ধিগত শ্রমের আপেক্ষিক উচ্চ কলা-কৌশল দেখাতে তিনি আগ্রহী হন। বুর্জোয়া সমাজের 'পিস রেটে' কাজ করার একটি বিশেষ দিক এই সাহিত্যকর্ম।

একমাত্র উৎপাদিত দ্রব্যের জনপ্রিয়তার মূলধন-নিয়ন্ত্রিত মানই যেহেতু অধিক সুনাম দেয়, প্রতিযোগীকে দূরে রাখে, ফলে বিষয়বস্তু হয় প্রায়শই রাস্তার নোংরা কথা বা পাবলিক ল্যাট্রিনের দেয়াললিপি—কিন্তু লিপিচাতুর্যে তাকে এঁরা অন্যতর তথাকথিত সুষমা দিয়ে থাকেন।

১৯২৮ সালে গর্কী তরুণ শ্রমজীবী লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সভায় সরলভাবে ব্যক্তি ও সমাজের প্রশ্নটি শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন সমাজই তার নিজস্ব সৃজনশীলতার দাক্ষিণ্যে শিল্পকর্মটির যোগান দেয়, শিল্পী তাঁর ব্যক্তিত্ব অনুসারে তাকে উপযুক্ত আঙ্গিক-প্রকরণ প্রভৃতিতে প্রকাশ বা পরিবেশন করতে পারেন। শিল্পী যখন সমাজের সৃজনশীলতার সঙ্গে অপরিচিত হয়ে পড়েন, তখনই কলাকৈবল্যবাদ, 'ব্যক্তিই সমাজ' ইত্যাদি আপ্তবাক্যের প্রচলন ঘটে।

ফাউস্তের চারিত্র্যউপাদান লোককথায় গ্যেটে বা মারলোর ঢের আগে থেকেই পরিচিত ছিল। সার্ভেন্তেসের অনেক আগেই জনসাধারণ ভেঙে-পড়া সামন্ত-প্রথার নাইট-যুগের তথাকথিত বীরদের ঠাট্টা করতে শুরু করেছে। "মিল্টন এবং দান্তে, মিকিভিৎস, গ্যেটে এবং শীলার—এঁরা যে এত ঊর্ধে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তার কারণ এঁরা সমষ্টির সৃজনশীলতার দ্বারা দীপ্ত হয়েছিলেন, প্রেরণা পেয়েছিলেন প্রচলিত জনপ্রিয় গাথাবলী থেকে। সে উৎস সুগভীর, বিচিত্র, প্রাজ্ঞ এবং সম্পদশালিনী। ব্যক্তিগতভাবে কোনো কবি এতে খাটো হচ্ছেন না। বরং বলা যায়, আকাটা হীরক হল সমষ্টি বা সমাজের বিষয় আর তাকেই মেজে-ঘসে কেটে-কুটে চমৎকার মণিমাণিক্যের সন্ধান দেয় শিল্পী-ব্যক্তিত্বের শিল্পকৌশল। শিল্প অবশ্য ব্যক্তির সঙ্গেই যুক্ত, কিন্তু সমষ্টিই কেবলমাত্র সৃজনকর্মের যোগ্য। জনগণ গড়েছেন জিউস, আর তাকে কেবল মর্মর প্রস্তরে রূপ দিয়েছেন ফিদিয়াস।"

জনসাধারণ তাই একধরণের পতিতপাবনী গঙ্গাধারা, যার ভাবধারায় অবগাহনেই শিল্পীর যথার্থ শিল্পসম্পদের পরামুক্তি ঘটতে পারে।

জনসাধারণকে যে বোধগুলি ঐক্যসূত্রে বেঁধেছে, কবির যদি সেগুলি বিষয়ে ধারণা না থাকে, তাহলে কবিকে তাঁর স্বল্পালোকিত অভিজ্ঞতার কূপমণ্ডুকতায় আত্মকণ্ডুয়ন করে যেতে হবে। কেবলমাত্র চাতুর্য আর মুন্সিয়ানা, অথবা ফাঁক ধরা যাতে না পড়ে সেজন্য অন্য কবির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, অন্যদেশী কবিকে অনুবাদ করে ক্রমাগত টিঁকে থাকতে হবে। আর এই টিঁকে থাকার জন্য কোনো মায়াবী টেবিল নিয়ে মগ্নও থাকতে হয়। ফলে ঐ ধরণের কবি জনবিদ্বেষী, রক্ষণশীল, এবং জীবনের বিকাশ সম্পর্কে নিস্পৃহ বা বিরোধী হয়ে ওঠেন। স্বদেশী ও আন্তর্জাতিক জীবন-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার মস্ত স্তাবক হয়ে পড়েন তিনি। বিস্তৃত সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের দেশের শহুরে মধ্যশ্রেণীভুক্ত জীবন চারণার ফলে অনেক সময়েই দেশের ঐতিহ্যময় জীবনধারা বা তার গভীরতর বিষয়ে এঁদের কোনো ধারণা জন্মে না।

ইউরোপে বুর্জোয়া জগতের জন্মলগ্নে এমনটি ঠিক ছিল না। বরং তখন মধ্যযুগীয় সমাজে প্রচলিত প্রতিক্রিয়া ও স্থাণু ব্যবস্থার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কাহিনী, উপকথা ও ভাবনায় শিল্পীরা অবগাহন করতেন। পুরাতন জগতের ধারণাগুলি আত্মস্থ করে মহৎশিল্পী তখন শিল্পের মহত্ত্বকে মর্যাদা দিতে পেরেছেন। মধ্যযুগের অন্তিম দশায়, সাধারণ মানুষের অন্তর লোকের সংবাদ জানা ছিল বলেই আলেঘরি দান্তে মহৎ কাব্য রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তেমনি জেনেছিলেন শেক্সপীয়ার, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কালের সাধারণ মানুষের অন্তরলোক। শিল্পের ভাবসম্ভার আছে জনগণের অন্তরলোকে, শিল্পের রূপসম্ভার আছে শিল্পীর রচনাকৌশলে। বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে চলতি জীবনের মধ্যে থেকে বীরত্বের ছোটখাটো অংশকে জুড়ে লোকগাথায় বীরকাহিনী গড়ে ওঠে। এর অনেকখানি বাস্তব, কিছুটা কল্পনা, কিন্তু ঈপ্সায় থাকে মানুষের শত্রুদের পরাজয়। এমনিভাবে গড়ে ওঠে পৌরাণিক ও মিথলজির বীরগাথা। এমনিভাবেই মৃত্যুকে জয় করতে বের হন

কত গিলগামেশ-নচিকেতা-বেহুলারা। এমনিভাবেই বিরুদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায় প্রমিথিউস, হ্যামলেট, গোরা, পাভেল, আঁদ্রে নাখোদকারা! গড়ে ওঠে রবিনহুড, উইলিয়াম টেল, ওয়াট টাইলার, ম্যুনজার, নানাসাহেব, সত্য ও কল্পনার মিশ্রণে কত চরিত্র। ছোটখাট রামচন্দ্রেরা লড়েছেন বিরুদ্ধ রাক্ষস-শক্তির বিরুদ্ধে, একজন বাল্মীকি আসেন, যিনি রূপ দেন রাবণত্রাস নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের।

তলস্তইর 'হোয়াট ইজ আর্টে'র সব বক্তব্য আমরা অনেকেই মানতে চাইব না। না মানলেও এটুকু মানতে ক্ষতি নেই যে "শিল্প ভাষার মতোই যোগাযোগের মাধ্যম, সুতরাং প্রগতিরও, অর্থাৎ মানুষের পূর্ণতর হয়ে ওঠার অগ্রগতির বাহন ··বিগত কয়েক প্রজন্মের মানুষজনের নিকটে শিল্প তাদের পূর্বসূরি জনগণের ও তাদের নিজের যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষদের অনুভবগুলির অভিজ্ঞতা এনে দেয়··· কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ চিন্তার ক্ষেত্রে যোগাযোগ ঘটায়, আর শিল্পের মধ্য দিয়ে মানুষ কেবল বর্তমানের সব মানুষের অনুভবের সঙ্গেই নয়, অতীত ভবিষ্যতের সঙ্গেও যোগাযোগ রচনা করে।" অবশ্য অতীতের সব অভিজ্ঞতাই যে পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে অনুভব করতে হবে এমন নয়, বহু ধারণা ও বোধ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেয়েও যায়। নতুন নতুন ভাবসম্পদ ও অনুভব গড়ে ওঠে। শিল্পের লক্ষ্য হলো সেই অনুভবগুলির উদ্বর্তনের ক্ষেত্রে সক্রিয় প্রভাব রাখা, "নিচু ধরণের ভালোবোধও, মানবজীবনকে সুন্দর করে তুলতে যেগুলির প্রয়োজন কম, সেগুলিকে বদলে ফেলা।" তলস্তইব এই তথাকথিত "নিম্নমানের, নিচু ধরণের ভালোবোধ" ইত্যাদি বিচার করা যদিও কঠিন, তা সত্ত্বেও তলস্তই শিল্প উপভোগকারী হিসাবে আদর্শ কল্পনা করেছিলেন 'সাক্ষর কৃষি-মজুর'। অবশ্যই তলস্তইর আদর্শ 'সাক্ষর কৃষি-মজুর' পাওয়া কতদূর সম্ভব আমাদের সমাজে তা সত্যই বলা কঠিন। তবু একথা বলা দরকার, কৃষকের চোখে তলস্তইর যুগে রাশিয়ার প্রধানসমস্যা ছিল সামন্ত

প্রথা। কি-উপন্যাসে কি-গল্পে তিনি এই প্রথার প্রতিবাদে কৃষকের বৈপ্লবিক আকুতিকে বুঝতে এবং রূপ দিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লেখক হিসাবেও সার্থক হলেন এজন্যই যে, তিনি আমাদের স্বদেশের সাধারণ মানুষের জীবনের ভাববস্তু আহরণ করতে পেরেছিলেন, ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ শিল্পীর কাছে প্রয়োজন, প্রথমত, জনজীবনের ঐক্যরচনাকারী ধারণাগুলি সম্পর্কে বোধ ও অভিজ্ঞতা ; দ্বিতীয়ত, ভাববস্তু বাছাই করার দৃষ্টিভঙ্গী ; এবং তৃতীয়ত, প্রকাশের ক্ষেত্রে রচনাকৌশল। প্রথমটির যদি দারিদ্র্য থাকে, তবে ভাববস্তু বাছাই করার প্রয়োজন তাঁর থাকেনা, তখন আত্মকণ্ডুয়ন, এবং সহজপন্থা হিসাবে যৌনতা আর লিপিচাতুর্য, কিংবা কেবলমাত্র লিপিচাতুর্যই তাঁর অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ কফিনের উপরের চমৎকার কারুকাজ করার 'শিল্পকর্ম' তিনি মোক্ষ বলে মনে করবেন।

কিন্তু ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব নেই—এই অনৈতিহাসিক ধারণার সূত্র কোথায়? এ ধারণা বুর্জোয়া সমাজই গড়ে তুলেছে। একদা যা ছিল মধ্যযুগীয় উদ্‌ভিদ-প্রতিম জীবন থেকে মুক্তির মন্ত্র, বর্তমানে তা হয়ে উঠেছে মনোপলি ক্যাপিটালিজমে দাসত্বের শৃঙ্খল। বুর্জোয়া সমাজে মূলধনই রাজা। আর বাজারে দ্রব্য-বিনিময়ের ফলেই এখানে সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রবহমানতাও কিছু পরিমাণে বজায় থাকে, তাই এ সমাজে মানুষের মর্যাদা তার বিনিময় মূল্যেব মানদণ্ডেই নিরূপিত হয়। এমন-কি একটু লক্ষ্য করে খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায় সাহিত্যকর্মও অধুনা হয়ে পড়োছ বিক্রেয় পণ্যমাত্র। সর্ব-দুঃখক্লেশের ঔষধ হিসেবে পুঁজিবাদ উপহার দেয় মদ, মেয়েমানুষ ও ঘুমের বড়ি। অথচ এরই বিপ্রতীপে শোষণের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে ওঠে, আর সাধারণ মানুষের অন্তরলোকে দানবীয় উৎপাদন-সংগঠনের জায়গায় সৎ ও মানবিক গুণসমৃদ্ধ অন্য সমাজের ছবি উঁকি দেয়। কবি যদি এই জগতের অন্তরলোকের সাহচর্যে থাকেন, তবেই তাঁর যথার্থ কবি

হয়ে ওঠার সুযোগ থাকে। নইলে শেষ পর্যন্ত 'রাজার এঁটো'র দলে তাঁকেও দাসত্ব করতে হয়।

১৯৬৩ সালে মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক দর্শন কংগ্রেসে বুর্জোয়া জগতের দার্শনিকরাও ব্যক্তিত্বের সংকট নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ কংগ্রেসে মার্কিন দার্শনিক হর্বট ডব্লু স্নাইডার তাঁর রিপোর্টে বলেন, মানুষ আজ তার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়েছে, আর তাকে বিপথে চালিত করার জন্য নানাপন্থা তাকে ক্রমাগত হতচকিত করে তুলছে। ফরাসী দার্শনিক সেভে বলেন, বুর্জোয়া দর্শনে আর মহত্ত্ব নেই—এ হলো সতঃসিদ্ধ কথা। দেকার্তে, দিদেরো, স্পিনোজা, হেগেল বা ফয়েররাখের মতো আর কোনো ব্যক্তি চোখে পড়ে না। কবিতার ক্ষেত্রেও আর তেমন কণ্ঠস্বর কানে আসে না। এখন তাই "থিংস্ ফল অ্যাপর্ট···সেণ্টার ক্যানট হোল্ড।" এখন কবির সামাজিক দায়িত্ব অনেক বেশি। সে দায়িত্ব বিপ্লবীর দায়িত্ব।

কবিতা বা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে বহুবিধ মতবাদ আছে। আজকের যুগের অ্যাবসার্দ, হার্মেটিক এ-সব প্রক্ষিপ্ত মতবাদগুলির কথা বলছি না। ঘুরে ফিরে আসছে সেই রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার কথা। গর্কী সরল ভাবে এ গুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে বিশেষভাবে রোমান্টিকতার কথা আমরা উল্লেখ করব। গর্কী রোমান্টিকতাকে আবার দুটি উপধারায় ভাগ করেছিলেন। একটি তার অ্যাকটিভ অপরটি প্যাসিভ। প্যাসিভ রোমান্টিকতা চলতি জীবনকে মেনে নিতে মানুষকে প্রবোচনা দেয়। বাইরের ঘটনাবলী থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে নিয়ে, বন্ধ্যা আত্মকণ্ডুয়নের মাধ্যমে আপনার মধ্যে 'সত্তায়' প্রবেশ ক'রে এই রোমান্টিক লেখকেরা জীবনের অমীমাংসিত সমস্যা, যেমন প্রেম, মৃত্যু ও অন্যান্য অগম্য বিষয়গুলি নিয়ে নিমজ্জিত থাকেন, অথবা যে সমস্যাগুলি বিজ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত তথাকথিত মানসবিহার বা ধ্যান করে বোঝা যাবে না—সেগুলি নিয়ে এঁরা মুহ্যমান হন। আমাদের

দেশেও কাঁড়ি কাঁড়ি এই 'পিওর' 'মেটাফিজিক্যাল' ইত্যাদি ইত্যাদির ছড়াছড়ি এখন। এঁদের আরেকদল আবার প্রবল নৈরাজ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। অন্যদিকে অ্যাকটিভ রোমান্টিকতা মানুষের বাঁচার ইচ্ছাকে জোরালো করে তোলে। তার চারপাশের ক্লিষ্ট জীবনের উর্ধে তাকে উত্তীর্ণ করে দেয়ঃ ঘাড়ে চাপানোর মতো যে-কোনো জোয়ালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এ পথের শিল্পীরা। গর্কী এর নাম দিয়েছিলেন বিপ্লবী রোমান্টিকতা।

'লেখার ইচ্ছা কেন হয়', ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গর্কী এই অ্যাকটিভ রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। জনৈকা পঞ্চদশী কিশোরী লেখিকা হবার সাধ বর্ণনা করতে গিয়ে গর্কীকে লিখেছিল, সে লেখিকা হতে চায়, কেননা তার "আপাদমস্তক চেপে বসেছে একেঘেয়ে জগদ্দল জীবন"। গর্কী বলছেন, এই সম্ভাব্য লেখিকা যদি রোমান্টিক ভাবে লেখে, তাহলে সে জগদ্দলের মত ভারী একঘেয়ে জীবনের কথা লিখতে গিয়ে কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে বাস্তবের উর্ধে উঠে চমৎকার মানুষজন নিয়ে এক কল্প-কাহিনীর অবতারণা ঘটাতে পারে। অর্থাৎ স্বপ্নপ্রয়ানের এক সিন্দারেলার কাহিনী।

সপ্তদশবর্ষীয় এক তরুণ শ্রমিক গর্কীকে লিখেছিল 'অভিজ্ঞতা'ই তাকে লিখতে প্রণোদিত করছে। অর্থাৎ পঞ্চদশী কিশোরীর জীবনের একঘেয়ে ঘটনা নয়, এর জীবন ঘটনাপুঞ্জের সম্পদে সমৃদ্ধ। গর্কী নিজের রচনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, একদিকে বুকচাপা একঘেয়ে জীবন ও অন্যধারে বহু অভিজ্ঞতার ছাপ তাঁকে কেমন করে লেখক করে তুলেছিল। গর্কীর কাছে এ ক্ষেত্রে তাই শিক্ষা নেবার বিষয়টি হলো—জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা জানতে হলে, জনগণের জীবনের সঙ্গে মিশে থাকতে হবে, বাইরে থেকে তা জানা সম্ভব নয়। রচনার পদ্ধতি হবে, হয় বিপ্লবী রোমান্টিকতা, নইলে বাস্তবতা। এবং সে বাস্তবতাও হবে এ যুগে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কবিকে বিপ্লবী হতে হবে। আর

এই বিপ্লবী চরিত্রের ছাপ যুগের মধ্যেই উৎকীর্ণ আছে। কবিকে তা আবিষ্কার করে নিতে হবে। কবিতা ও বিপ্লবের মধ্যেকার সমস্যাকে অন্তত তিন রকম ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো যেতে পারে। অবশ্য এই ত্রি-ধারা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশেই থেকে যায়। প্রথমটি একেবারেই নন্দনতাত্ত্বিক। এই অংশটিতে আলোচনা করা যেতে পারে শিল্পে বা কবিতায় কি ভাবে আমাদের সামাজিক ও বিপ্লবী পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেছে; কি ভাবে বৈপ্লবিক অবস্থা ধরা পড়েছে প্রকরণে, বিভিন্ন শিল্প-মাধ্যমগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। আবার শিল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু, সুন্দর-অসুন্দর প্রভৃতি শিল্পের নান্দনিক বোধগুলি কি ভাবে ঐ প্রকরণের সহায়তায় বিচার করা সম্ভব তাও দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক শ্রেণীগুলির বৈপ্লবিক ভূমিকা বিপ্লবের ক্ষেত্রে কি ধরনের, অথবা ঐ শ্রেণীগুলির চাহিদা কবিতায় (বা শিল্পে) কতখানি প্রতিফলিত হচ্ছে, এবং কি ধরণের ভাববস্তু তাতে ছড়িয়ে আছে তারই আলোচনা করা। তৃতীয়ত, সমাজগত নন্দনতাত্ত্বিক দিকটিরও আলোচনা করা দরকার। কবিতার আত্ম-সচেতনতা, কবিতার সামাজিক অবস্থান, বিপ্লবী মতবাদ ও জনগণের সঙ্গে তার সম্পর্ক—এক কথায় বিপ্লব ও রসশাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গেই বা তার সম্পর্ক কী, এ সবকিছু তৃতীয় দিকটির অংশীভূত। এই অংশেই আলোচ্য হয়ে পড়ে কবিতার সামাজিক দায়িত্বের কথা। সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, কবিতার আঙ্গিক, তার সামাজিক ভূমিকা, গঠন, বিষয়বস্তু প্রভৃতি কি ভাবে কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির উপরে প্রভাব রাখে, আবার এই প্রভাবগুলি শিল্পের উপরেও বিপ্লবের চাপে প্রভাব ফেলে কেমন পরিবর্তন আনে এগুলি এই তৃতীয় অংশে রাখা চলে। কবি তাই ঘটনার দ্রুত পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর পটুয়ার ভূমিকাতেই সন্তুষ্ট থাকেন না। সাধারণ ভাবে সামাজিক সচেতনতার দিকগুলি এবং বিশেষ ভাবে শিল্পীজনোচিত সচেতনতার

দিকগুলি লিপিচাতুর্যের সাহচর্যে কবিতায় বিম্বিত করে তুলে, যে শিল্প-আঙ্গিক সামাজিক ও আদর্শগত ব্যবস্থাকে প্রতিবিম্বিত করে তুলবে—কবি তার পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। সামাজিক ও শিল্পগত দায়িত্ব গ্রহণ তাই কঠিন, আর যা কঠিন তাকে এড়িয়ে যাওয়া, বা নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য শিল্পের সামাজিক দায়িত্ব নেই ইত্যাদি বলা দুর্বল কাব্য-ব্যক্তিত্বের অধিকারী কবির পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যথার্থ কবি, যিনি হয়ে ওঠেন ঝড়ের পাখি এবং যাঁর জানা ঃ

সমুদ্রের রূপোলি সমতলে হাওয়া ঘনিয়ে তুলেছে ঝড়ের মেঘ, আর কালো রোমশ বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো ঝড়ের পাখি ঘুরপাক খেলছে মেঘ আর সমুদ্রের সীমান্তে। কখনো তার ডানায় চুমো দিচ্ছে ঢেউ, কখনও সে জ্যামুক্ত বাণ, উঠে চলেছে মেঘ ছিঁড়ে, ভীষণ চিৎকারে, ঝড়ের পাখির সাহসী স্বরগ্রামে মেঘ চিনে নিচ্ছে এক উল্লাস।

সেই চিৎকার আকাঙ্ক্ষা জানায় ঝঞ্ঝার! জানান দেয় তার আবেগের তীব্র শিখার তাপ, তার ক্রোধ আর তার জয়ের প্রতি আস্থা।

গাংচিলেরা ভয়ে কাৎরায়—কাৎরায়, জলের উপরে দ্রুত চলেছে উড়ে আর সমুদ্রের মসীকৃষ্ণ গহিনে তারা সানন্দে লুকিয়ে রাখবে তাদের ভয়।

আর সমুদ্র-শালিখেরাও কঁকিয়ে উঠছে। সংগ্রামের নামহীন উল্লাস তাদের জন্য নয়। বজ্রের গর্জনে তারা ভীত-ত্রস্ত।

আর বোকা পেঙ্গুইনেরা পাথরের ফাটলের মধ্যে ভয়ে কাঁপছে, একা কেবল একা ঝড়ের পাখি গর্বের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে উড়ছে সমুদ্রের উপর, উড়ছে রূপোলি ফেনার উজ্জ্বল জলরাশির উপরে।...

ক্রমশ নীচের দিকে ঝুঁকে নেমে আসা, ক্রমশ কালো হয়ে ওঠা ঝড়ের মেঘ ডুব দিচ্ছে সমুদ্রে আর সঙ্গীতমুখর তরঙ্গদল লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে বজ্রের আকুতিতে ক্রমশ উঁচুতে।

বজ্র গর্জে ওঠে। জলরাশির সঙ্গে তুমুল লড়াইয়ে মেতে উঠেছে হাওয়ার বাহিনী। আর ঝড় মত্ততায় জলরাশিকে জড়িয়ে ধরেছে অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে, পুঞ্জ ফেনিল হরিৎ পান্না পাথরে চূর্ণ করে দিতে ছুঁড়ে মারছে।

কালো রোমশ বিদ্যুতের রেখার মত ঘূর্ণি ঘুরে চলেছে, চিৎকার করছে

ঝড়ের পাখি. ঝড়ের মেঘ চিরে সে ছুটেছে জ্যা-মুক্ত বাণ, জলরাশি ছিঁড়ে চলেছে দ্রুত।

দানবের মতো সে অভিশাপে ফুঁসে ওঠে, ঝড়ের ঐ কালো অপদেবতা এই ফেটে পড়ছে হা হা হাসিতে, এই উঠছে ফুঁপিয়ে—ঝড়ের মেঘপুঞ্জকে সে ফুৎকার জানিয়ে হাসে, ফুঁসে উঠছে তার নিজের আনন্দে।

বজ্রপাতের ঝঞ্ঝনায় বিজ্ঞ সেই দানব রণক্লান্তির হাঁপ ধরে আসা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পাচ্ছে। সে স্থির জেনেছে মেঘরাশি সূর্যকে আড়াল করতে পারে না ; ঝড়ের মেঘ কখনই, কোনো কালেই সূর্যকে মুছে দিতে পারবে না।

'মহাসিন্ধু গর্জে ওঠে······বজ্রপাত ঝঞ্ঝনায়

কৃষ্ণনীলাভ বিদ্যুৎরেখা সমুদ্রের বিপুল বিস্তারের উপরে ঝড়ের মেঘে মেঘে ঝলসে ওঠে ; অগ্নিমুখ বাণগুলির লুফে নিচ্ছে সমুদ্র, ; আর নিভিয়ে ফেলছে জলরাশিতে ডুবিয়ে ; গভীর গহিনে তাদের আঁকাবাঁকা সর্পিল প্রতিবিম্বগুলি কুঁকরে উঠে যন্ত্রণায় শেষনিঃশ্বাস ফেলছে হিস হিস ক'রে।

ঝড় আসছে। শীঘ্রই ঝড় ভেঙে পড়বে মাথার উপরে !

তবু সেই ঝড়ের পাখি বিদ্যুতের ঝনৎকারের মধ্যে ঘুরপাক খেলে যায়, গর্জমান ক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের উপরে, তার চিৎকার প্রতিধ্বনিত করছে উল্লাস মহাবিজয়ের ভবিষ্যৎবাণীর মতো—

নেমে আসুক সেই ঝড় চণ্ড মত্ততায় ॥

বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের বিয়োগে, শোকার্তা ক্রৌঞ্চীর বেদনায় স্বতোৎসারিত শব্দের ছন্দোবদ্ধ রূপে বাল্মীকি নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় ঋষিকবি ছন্দোবাণবিদ্ধ হলেন, ছন্দের ব্যবহারের যথার্থ দিকটি সম্পর্কে চিন্তান্বিত হয়ে আবিষ্ট হয়ে রইলেন। শব্দসমাহারের সেই ছন্দোবদ্ধ রূপ, যা শোক থেকে নির্গত, সেই শ্লোক, কবিতার ক্ষমতার রূপটি প্রকাশিত করল। মুখ থেকে 'মা নিষাদ' ইত্যাদি নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আদিকবি বিস্মিত হয়ে, চমকিত হয়ে বললেন 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'। কেন বলেছি, কেমনভাবে বললাম নয়, কি উচ্চারিত হলো সেইটাই তাঁর বিস্ময়পূরিত জিজ্ঞাসা। বাল্মীকি রাম-জন্মের ষাট হাজার বৎসর পূর্বেই রামায়ণ রচনা করলেন, লিখছেন কৃত্তিবাস। বাস্তবে যা দৃশ্যমান, সেটাই নির্বিশেষ সত্য নয়, কবির কাব্যের সত্যই যথার্থ সত্য—বাল্মীকির এই উপকথাটিতে তার যেন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল। কিন্তু এই কাহিনীর সবচেয়ে মূল্যবান অংশটি হলো শব্দসমূহের বিশেষ বিন্যাসগত আঙ্গিকটি, যা একটি শ্লোক। শ্লোকের ক্ষমতা বা শক্তিই উপকথাটির মূল বিষয়বস্তু। কালিদাস রঘুবংশের সূত্রপাতেই বলে নিলেন, পার্বতীপরমেশ্বরকে তিনি বন্দনা করেন বাক ও অর্থের বিশেষ সম্মিলনে, বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে। সুতরাং বাক্, বা এ স্থলে কাব্যভাষার তাৎপর্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আদিম চিন্তায় কবিতার ক্ষমতাকে দৃশ্যমান এবং মানবধর্মী করার জন্য নানা উপকথার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসেও তেমন একটি মহাকথার সন্ধান মেলে। কবিতার ক্ষমতাকে দৃশ্যমান ও মানবধর্মী করে তোলার জন্য সে দেশে অর্ফিয়ুস-কাহিনী অবতারণা করা হয়েছিল। অর্ফিয়ুসের

কাহিনীর তিনটি অংশ আছে। প্রথম, অর্ফিয়ুস প্রস্তর বৃক্ষাদিকে মোহিত করেছেন, পশুকে বশ মানিয়েছেন তাঁর সুর ও শব্দের সম্মিলনগত উচ্চারণের তাৎপর্যে; দ্বিতীয়, তাঁর পত্নী ইউরিডাইসের মৃত্যুর পর অর্ফিয়ুস আপন কবিত্বের প্রভাবে যমপুরীতে পৌঁছালেন, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে যথাবিহিত নিয়ম না মানায় ইউরিডাইসকে হারালেন; তৃতীয়, মদ্যমুগ্ধা মানেডরা মতান্তরে, থ্রেসীয় রমণীরা, তাঁকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে জলে ভাসিয়ে দিল। তারপর তাঁর ছিন্ন মস্তক সমস্ত নদীপথ সঙ্গীতের মূর্ছনায় মুখরিত করে এক গুহায় এসে ঠেকল। সেখানেও তাঁর মাথা দিবারাত্রি ভবিষ্যবাণী গেয়ে চলে, শেষে অ্যাপলোর অনুরোধে (অর্ফিয়ুস অ্যাপলোর ধর্ম-প্রচারীই ছিলেন) সে মাথা স্তব্ধ হলো। তাঁর বীণা বা লায়ার আকাশে এক নক্ষত্রমণ্ডলী রচনা করল। ওবিদের ভাষায়ঃ

বীণা উচ্চকিত শোকে, ক্রন্দনমূছিত বাণী তার
মৃতের গুঞ্জনে, প্রতিধ্বনি তোলে ব্যথিত পাহাড়।

এই কাহিনীর মধ্যে, পূর্বেই আমরা বলেছি, কবিতার ক্ষমতাকেও বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতা যেন সজীব, জড়, সকল বস্তুকেই আবিষ্ট করে; প্রেম সেই কবিতার অঙ্গ হয়ে জীবন-মৃত্যুর উপরে অপরিসীম প্রভাব বয়ে সুবিস্তৃত; এবং কবি আত্মধ্বংসের মধ্য দিয়েও ভবিষ্যবাণী বলে চলেন; তাঁর হাতের বীণা অমরত্বের প্রতীক দূরতম নক্ষত্রমণ্ডলীতে স্পন্দিত হয়।

জ্ঞানবৃদ্ধ সোক্রাতেসের কাছে তবু কবি দেবতা-পাওয়া মানুষবিশেষ। প্লেটোর নিকটে কবিরা নীতিভ্রষ্ট, কেননা যুক্তির তাঁরা ধার ধারেন না, বিশ্বাস করেন প্রেরণায়। কবিরা অসত্যসন্ধানীও—কেননা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের অনুকরণেই কবিতার সৃষ্টি। প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে এই 'নীতিভ্রষ্ট ও অসত্যসন্ধানী' কবিকে নির্বাসিত করেছিলেন। অবশ্য প্লেটোকে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রথম গুরুও বলা হয়। তিনি রিপাবলিকের সুরুতেই,

কবি যদি রাষ্ট্রনীতিকে কবিতায় প্রকাশ করেন, তবে তাঁকে রাষ্ট্রে বাসাধিকার দেওয়া চলবে—এমন একটা রায় দিয়েছিলেন।

যেন সে তাগিদেই প্রবল প্রতাপান্বিত রাষ্ট্রবাদী নাৎসীরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল তাদের মতের বিরোধী কবি-শিল্পীদের। দণ্ড দিয়েছে বিরুদ্ধবাদীদের। আজকেও রাষ্ট্রবাদী দেশগুলিতে কিংবা গণতন্ত্রের ভেকধারী সমরবাদী রাষ্ট্রতন্ত্রে কবি ও শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ নিতান্ত কম হচ্ছে না। মনে পড়ছে, পাবলো নেরুদা হাওয়ার্ড ফাস্টের উদ্দেশ্যে একটি কবিতায় সেই ম্যাকার্থি-যুগে লিখেছিলেন 'অন্যসব মানুষকে যন্ত্রণায় দীর্ণ করে দেবার আগে তারা আক্রমণ চালায় কবিদের উপরে'।

আমাদের দেশে প্রাচীনবিজ্ঞরা কিন্তু কবিকে মূর্খ বলতেন না। বরং উল্টো। কঠোপনিষদে কবিকে বিজ্ঞ বলা হয়েছে ('আত্মজ্ঞানের পন্থা ক্ষুরের ধারের মত···, কবিরা বলেন') এবং আমাদের দেশে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানকে তথাকথিত যুক্তি-সিদ্ধ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হতো। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চের উর্ধে যে প্রকৃতজ্ঞান, প্রাচীন বিজ্ঞদের ভাষায় তাকেই বেদ বলা হয়েছে। সেই বেদই—বিশ্বনিয়ম ঋতের সহায়তার বিশ্বজগত ধারণ করে আছে। সেই বিশ্বনিয়মের বেদ উদ্ধারেই ভগবান যুগে যুগে জন্ম নেন। প্লেটোনিক উক্তি ও আমাদের প্রবীণ ঋষিদের উক্তি তাই একসূত্রে মিলছে না।

প্লেটোর মতে যুক্তিগত তাৎপর্যেই বিশ্ববীক্ষা, ভারতীয় ঋষিগণের মতে কার্য-কারণের যুক্তি দিয়ে 'বিজ্ঞান' অর্জিত হতে পারে বটে, কিন্তু পরা জ্ঞান বা পুরো সত্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। জনক-সভায় যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী গার্গীকে অতিযুক্তির অসম্পূর্ণতা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আর নয়, তোমার মাথা খসে যাবে!' শব্দগত আপাতঅর্থ উক্তিটির যাই হোক না কেন, আমরা এ উক্তিটিকে প্রতীকার্থে প্রয়োগ করে বলতে পারি, প্রপঞ্চোত্তর ও সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মকে বোঝা যুক্তির অসাধ্য।

সে যাই হোক যদি শব্দের যথার্থতা অন্বেষণ করতে চাই, তাহলে যুক্তিকে আমরা বেশি দূর নিয়ে যেতে পারব না, কেননা প্রতিটি শব্দই ইতিমধ্যে আয়ত্তাধীন বস্তু, ভাব প্রভৃতির ধ্বনিগত প্রতীক মাত্র। যা জানিনা, তার প্রতীকও তৈরি হলো না। যা বুঝতে চাই, তা ইতিমধ্যে বুঝে নেওয়া জ্ঞানের প্রক্ষেপ বা প্রজেকশন মাত্র।

ইতিমধ্যে আয়ত্তাধীন জ্ঞানও অসম্পূর্ণ—কিন্তু বিশ্বকে পুরোপুরি বোঝবার জন্য, আবিষ্কারের জন্য অন্বেষণের শেষ নেই। অথচ উপকরণ হলো অর্জিত জ্ঞানের প্রতীকীভূত শব্দ।

কবিতা রূপকবহুল। ভাষাও তাই। ভাষার সহায়তায় বিশ্বকে নিরঙ্কুশভাবে প্রকাশ করাও যুক্তিসিদ্ধভাবে অসম্ভব। আবার, জীব-জগতের বিস্ময়কর প্রাথমিক শিল্প শব্দই এবং শব্দের বিশেষিত রূপনিয়ামক হিসাবে অতঃপর এসেছে ব্যাকরণ, যথানিয়ম-পরম্পরায় শব্দগুলি সংস্থাপনের প্রয়োজনে। ব্যাকরণ অনুসারী শব্দবিন্যাসকে আমরা ভাষা নাম দিয়েছি।

কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক এতদূর পর্যন্ত মনে করেন যে, বিশেষ ব্যাকরণপদ্ধতি অনুযায়ী শব্দ সাজানোর নিয়ম মনকেও শব্দানুসারী করে গড়ে তোলে। ঐ ব্যাকরণ অনুযায়ীই চিন্তার পদ্ধতিতে মন শব্দগুলিকে সাজিয়ে যাবে। আমরা বাঙালিরা যে ভাবে চিন্তা করব, অন্য ব্যাকরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠির মানুষ তাদের ভাষা সাজানোর কায়দার জন্যে ভিন্ন পদ্ধতিতে চিন্তা করবে। এক্ষেত্রে পদ্ধতিটি শব্দসজ্জা-সাক্ষেপ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

ভাষা সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত নয়, যেমন হাত, পা, চোখ। তা কৃত্রিম, মানুষ রচিত, এবং ভাষাগোষ্ঠির তা উত্তরাধিকার। সেজন্য art বা শিল্পের প্রাথমিক সংজ্ঞার সঙ্গে ভাষা সম্পর্কযুক্ত। হার্বার্ট রীড আর্ট আলোচনায় প্রসঙ্গত আঙ্গিক, অতঃপর রঙ, পরে কল্পনার সংগঠনগত উৎসারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। শব্দ আঙ্গিকলাঞ্ছন, এমন কি তার

সংগঠনের মধ্যে আছে রঙেরও বিমূর্তায়ন, শব্দের গভীরে আছে কল্পনা। আপাত অর্থে ধ্বনি উৎসারিত শব্দতো অর্থহীন। তারমধ্যে অর্থ এসেছে কিছুটা সামাজিক সামান্য অনুভব বিনিময়ের তাগিদে, বাকি ফাঁপা অংশটুকু ভরে নিয়েছে শব্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তিই। শব্দও অনড় নয়, ব্যবহারের তাগিদে তার পরিবর্তন হয়। এবং যেহেতু মানুষ ভাষা ব্যতীত চিন্তা করতে অপারগ, সুতরাং ভাষা তার নিকটে ভাবনার বাহন। এবং চিন্তা মানেই নানাবস্তুগত প্রপঞ্চের প্রতিফলনজাত প্রতীকের বিন্যাসগত বিশেষিত মানসিক রূপ। মন গঠনের ভিত্তি সেজন্য বাস্তব কার্যকলাপ।

তদ্গত অবস্থায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমরা একা একা হাত-পা নাড়তে দেখে থাকি। যেন তিনি বাস্তব কোনো ক্রিয়া সম্পাদন করছেন। কোনও কিছু বোঝাতেও আমরা হাত-পা নাড়াই। কেউ বেশি কেউ কম মুখের ভাব পরিবর্তন করি; ইত্যাদি ইত্যাদি। এঙ্গেলস প্রমাণ করেছিলেন, হাতের ব্যবহারের সঙ্গেই আদি মানুষের মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘটেছে। সব কিছু ক্রিয়ার প্রতীক এখন শব্দ। তবু কর্মগত আদি উপাদানের রেশ মিলিয়ে যায়নি আজও। আসলে মানুষের চিন্তা যখন শব্দসাপেক্ষ, ভাষাঅনুসারী, তখন ভাষার শব্দগুলির যথার্থতাকে বাহন করেই মনের বিকাশ অনেকখানি নির্ভরশীল। আসলে মানুষের এই বোধ বা জ্ঞানের দিকটা এবং শব্দের মনমধ্যে ক্রিয়া একই সময় পুরুষ ও নারীর প্রতীক মাত্র। যেন গর্ভাধান।

মানুষের মনে যে মুহূর্তে শব্দের প্রবেশ ঘটে (নতুন শব্দ, নতুন অনুষঙ্গ) তৎক্ষণাৎ মন শব্দটি 'ধারণ' করে, এবং সেই শব্দ 'সঞ্চার' ক্রমশঃ চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে একসময় 'ধারণা' সম্পূর্ণ হয়। ভাষা যেন পুরো মানবিক রূপ। ইংরাজি ব্যাকরণে mood ও copula, conjunction প্রভৃতি নানা যৌনগন্ধী শব্দ রয়েছে। একটি প্রতীক ধ্বনি-গত ভাবে তৈরি হওয়া মাত্র, তার উদ্ভব অন্যান্য শব্দের সঙ্গে তুলনামূলক অর্থে উৎপেক্ষাময় ভাবে দেখা যাবে। আমরা যারা শব্দশিখতে কৃদন্ত ও

তদ্ধিতান্ত রূপগুলি পড়েছি, তাদের কাছে এই সিন্থেটিক দিকটি একেবারে অপরিচিত নয়। শেলি যথার্থই বলেছিলেন 'ভাষার যথার্থ বাস্তব সংগঠনেই কবিতা কী প্রমাণিতভাবে পাওয়া যায় না ?'

ভাষার সূত্রপাত চিন্তা করতে গেলে বিদ্বানরা বলেন ভাষা সব সময়েই রূপকনির্ভর, কল্পনাভিত্তিক, সিন্থেসাইসিং ও মহাকথাভিত্তিক। আমাদের দেশে সতীত্বের প্রতীক বলে লোকস্মৃতিতে পরিচিত অরুন্ধতী নক্ষত্রটি বিবাহরাত্রে বধূকে একদা দেখাবার রীতি ছিল। কিন্তু ঐ নক্ষত্রটি ছোট বলে পাশের বড় নক্ষত্রটি দেখিয়ে তারপর ক্রমে ছোট নক্ষত্রটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো। ন্যায়শাস্ত্রেও অনুরূপ একটি পন্থা আছে। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাবার সেই ন্যায়শাস্ত্রকে 'অরুন্ধতী ন্যায়' বলা হয়ে থাকে। অতিকথা বা মীথ এবং রূপক বা মেটাফর জীবিত ভাষার উদ্ভবে দুটি জীবন্ত পন্থা মাত্র, কেবল অলঙ্কার বা শৈলীমাত্র নয়। সুতরাং মীথ ও মেটাফর মনেরও দুটি বিশিষ্ট দিক।

তবুও যুক্তিনির্ভর এবং মেটাফর ও মীথ নির্ভর বলে ভাষাকে ভাষা-যথা-বিজ্ঞান এবং ভাষা-যথা-কবিতা এই দুভাগে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আই. এ. রিচার্ডস ঢের দিন আগেই বিজ্ঞানের ভাষাকে বলেছিলেন প্রসঙ্গ-নির্দেশিত ভাষা, আর কবিতার ভাষাকে বলেছিলেন আবেগ-নির্দেশিত। কিন্তু সত্যিই কি দু-ধরনের ভাষার অস্তিত্ব আছে ? বিজ্ঞানের চিন্তায় শব্দকে সঠিক, রূপকবিহীন এবং ব্যাপ্ত অনুষঙ্গনিরপেক্ষ ভাবে দেখতে হয়। বিজ্ঞানচিন্তায় বিকল্পরহিত সার্থক শব্দটিরই প্রয়োজন। কিন্তু শব্দ যেহেতু সাপেক্ষ ও রূপকনির্ভর সুতরাং রূপকনির্ভর শব্দ দিয়ে যথার্থ বিজ্ঞানের ভাষা নিরূপিত হতে পারে না।

তাই পূর্ণতম অমূর্ত চিন্তার প্রয়োজনে অনন্য একটি ভাষার সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। যথা গণিতভাষা। বর্তমানে ইলেকট্রনিক গণনা-যন্ত্রের দাক্ষিণ্যে এই সূচকচিহ্নিত ভাষার ব্যবহার ফলিত বিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। গণিতগত ভাষার সমর্থকগণ

বলেন, সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অনাবশ্যক বাহুল্যগত রূপকবহুল দিকগুলি বর্জন করতে হবে। গত চারশো বছর ধরে, ইউরোপে নবজাগরণের সূত্রপাত থেকে, ভাষাকে ধোলাই করে সাপসুফ করবার তাগিদে তর্কশাস্ত্রের প্রয়োগ এবং ফর্মাল লজিক চিহ্নিত গণিতের ভাষার প্রকাশ লক্ষ্য হয়ে পড়েছে।

শব্দের ব্যঞ্জনাগত যথার্থতার দিকে যে ফাঁক রয়েছে, সেই অপরিপূর্ণতার প্রতি সন্দেহ যে কবিদেরও হয়নি, তা নয়। শব্দের অমোঘ শক্তি, শব্দই ব্রহ্ম ইত্যাদি আপ্তবাক্যসমূহ উচ্চারণ করেও, তাঁরাই কবিতার ভাষা ও বিজ্ঞানের ভাষার মধ্যে সীমারেখা টানতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত গ্যেটের ১৮২০ সালের উক্তি—'বিজ্ঞান ও কবিতা একেবারে উল্টো বিষয়'—এক্ষেত্রে মনে রাখার মতো। সেই থেকে সরকারীভাবে কবিতাধর্মী মানসক্রিয়া এবং বিজ্ঞানধর্মী মানসক্রিয়ার মধ্যে তফাৎ করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞানের ভাষা, সঠিক অর্থগত তাৎপর্যে নেতিবাচক স্মৃতিচারণে মুখর। প্রতিটি শব্দই স্মৃতিলালিত, কিন্তু বিজ্ঞানের যথার্থ ভাষায় স্মৃতির আঁচড়টিও থাকা চলবে না, কেননা স্মৃতির সামান্য স্পর্শেও আবেগ ও কল্পনার ভীতি রয়েই যায়। শব্দ নির্বিশেষ-কাললাঞ্ছন অথচ তাৎক্ষণিক হবে বলেই বিজ্ঞানীদের মত।

এরাসমাস ডারুইন তাই বলেছিলেন, কবিতার ক্ষেত্রে ঢিলে ঢালা তুলনা বা উপমা রাখলে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু বিজ্ঞানে সঠিক তুলনাটিই দিতে হবে। কবিতায় চন্দ্রমুখী বলা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু বিজ্ঞানে তা চলবে না। কবিতায় চলে এজন্যই যে, কবিতা স্মৃতিবিধৃত, কবিতা স্মৃতিহন্তারক নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষা শব্দের ধ্রুব ও অনন্য অর্থটি স্মৃতিনিরপেক্ষ অর্থে শব্দ সংস্থাপনের যথার্থতায় তাৎক্ষণিক। এডগার এ্যালেন পো তাই বিজ্ঞানের উপরে সনেট লিখতে প্রথমেই সুরু করেন, 'ও রূপে কবির মন কেন কর তোমার শিকার'। আবার কয়েক পঙ্‌ক্তি পরেই বলেন, 'টেনে নামাওনি কী

তুমি রথ হতে, দেবী ডায়নারে'। ফলত ষ্টিফেন স্পেণ্ডারও লিখে ফেলেন, "বিজ্ঞানীদের মনেই সর্বজ্ঞান। এমনি কোনোও জগতের দেয়ালের কান নেই যা অর্ফিয়ুসের গান শুনতে পারে।"

পূর্বেই বলেছি রূপকময় শব্দকে যেন কবিরাও আর বিশ্বাস করছেন না। ভালেরির মতে শব্দ অবিশ্বস্ত এবং অসঠিক ; 'অবৈজ্ঞানিক'। এলিয়টও তাই বলেন। আরনল্ড কবিতার চিন্তায় অনুরূপ সন্দেহেই স্বস্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন ; এমন কী গ্যেটেও যে ঐ অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন তাও নয়। তাই কবিত্বময় ভাষার বিনাশ ঘটিয়ে চলতি শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্যে কবিতারচনা করার প্রয়াস চলেছে। শব্দের অনেকখানিই ভরাট রয়েছে সামান্য-স্মৃতিতে— ব্যক্তি ফাঁকা অংশটি পূর্ণ করতে পারেন সামান্যর কাছে অনেক বেশি উত্তরাধিকার পেয়ে।

আধুনিক কবিতার সূত্রপাতের দ্বিধা মূলতঃ একদিকে তাই শব্দব্যবহারের বিষয়ে সংশয়। কিন্তু চলতি কথার ঘসা পয়সায় যখন কবিতার সব দেনা মেটানো যায় না তখন হতাশভাবে আবার কাব্যিক শব্দের মধ্যেও ঝাঁপ দিতে হয়। কোলেরিজ এ বিষয়টি অনেকদিন পূর্বেই ভেবে রেখেছিলেন। তিনি যখন কবিতার ভাষাকে কথ্যভাষা বলে চিহ্নিত করতে চলেছেন তখন বিজ্ঞানের প্রাথমিক ফলিত বিকাশের বোলবোলাওর যুগ। বহু কবি বিজ্ঞানের বাইরের সেই ছটা দেখে মোহিত হয়ে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে কবিতার বিষয়বস্তু রূপে বা চিত্রকল্পরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এ দ্বন্দ্বের ঊর্ধে এখনও আমরা উঠতে পারিনি বলে এলিজাবেথ সীওয়েল তাঁর কবিতা বিষয়ক গবেষণায় বলেছেন বর্তমানে অতি প্রচলিত সাহিত্য সমালোচকদের সমালোচনা, "is directed toward logic and analysis by its preoccupation with the text of the poem as an abstract, self-contained, timeless system of

the formal relations; it is hampered in addition by something it shares with a number of scientific areas well—a tendency towards dogmatism."

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি বিজ্ঞানের ভাষা ও কবিতার ভাষায় কোনও অহিনকুলের দ্বন্দ্ব নেই। মূলতঃ দুই ধরনের আবেদন দেখা গেলেও ভাষাগত প্রতীকধর্মীতা উভয় ভাষাতেই লক্ষ্য করা যায়। বাক্যের নিয়মকানুন উভয় ক্ষেত্রে আলাদাও নয়। এবং রূপকনির্ভর ভাষা বলেই বিজ্ঞানের ভাষা যা অজ্ঞাত তার আভাস দিতে সমর্থ হয়। শব্দ যদি নিরঙ্কুশ ভাবে 'যথাযথ' হতো, তবে মনের উপর তার যেটুকু প্রভাব তা দিয়ে বেশিদূর পৌঁছানো যেত না। এমন কী গণিতের ভাষাও বিজ্ঞানের বিভাগে সমস্ত কিছু প্রকাশের যথার্থ ভাষা নয়। জীনস সাহেব ঈশ্বরকে মস্তবড় গণিতজ্ঞ বলা সত্ত্বেও, সেই গণিতজ্ঞের বিশ্বগণিত কেবলমাত্র সমীকরণ বিধৃত নয়। নানা বৈপরীত্যে ও জটিলতায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গঠিত।

এডিঙটনের পদার্থবিদের টেবিলের উপমাটি প্রসঙ্গত মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন একটি কাঠের টেবিল আমাদের চোখে পড়ে বটে কিন্তু আসলে পদার্থবিদের নিকটে ওটি কোটি কোটি পরমাণু অর্থাৎ ইলেকট্রন ইত্যাদির সমবায় বিশেষ এবং টেবিলটির মধ্যে অধিকাংশটাই ফাঁকা একেবারে পরম শূন্য। অর্থাৎ সেখানে পদার্থের অস্তিত্বই নেই। কিন্তু সেই ফাঁকা অবস্থাটি আমাদের চর্মচক্ষে ধরা পড়ছে না। সে বিচারেতো জীবদেহ কোটি কোটি কোষের সমষ্টি, শেষ বিচারে যা পরমাণু ইত্যাদি বলেই মানতে হয়। এ মানার মধ্যে কোথাও ভুল নেই, একথা জানি। কিন্তু জীববিজ্ঞানী কী তাঁর প্রণয়িনীকে কেবল জীবকোষের সমষ্টিই দেখেন, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ফুল বলতে কী কেবল হাইড্রোকার্বন বোঝেন? কোনো সম্পর্ক বোঝাতে গণিতের ভাষা প্রয়োজন হতে পারে, যথা $E=MC^2$ প্রভৃতি, কিন্তু তত্ত্বটি যথার্থ প্রকাশের জন্য বিজ্ঞানীকে পুনরায় রূপকময় ভাষায়

ভাবতে হয়, প্রকাশ করতে হয়। এমন কী স্বয়ং আইনষ্টাইনও বলেছেন যে পদার্থের যথার্থরূপ আমাদের সমস্ত জ্ঞান সত্ত্বেও ধরা পড়ে না, কেননা আমাদের মন বা বুদ্ধিরও নিজস্ব অক্ষ, মাত্রা ও তল রয়েছে। সেই অবস্থা থেকে যথার্থকে সঠিক নিরঙ্কুশ ও নির্বিকল্প যথার্থতায় দেখা যায় না। কেমনা, একেবারে পুরোপুরি বস্তুসাপেক্ষ বা পুরো অবজেকটিভিটি নিয়ে কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত ই. এইচ. কার ইতিহাসের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলেন, 'আগে ঐতিহাসিককে পড়ে নাও, তারপর ঐতিহাসিক বিবরণ পড়লেই চলবে'।

বিজ্ঞান বিষয়েও অনুরূপ কথা বলা যায়, আগে বিজ্ঞানীকে বুঝতে হবে, তারপর তার বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্য। অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষটিকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত করা অসম্ভব। সামান্য আসক্তি মানেই দুর্বলতা এবং যেটুকু শূন্যস্থান বিশ্লেষণের আয়ত্তাধীন নয় তা কল্পনা দিয়েই ভরাট করতে হবে। তাই বিজ্ঞানচিন্তার বিশাল অংশই কল্পনা-সাপেক্ষ, যেমন ঈথার, নেতিমূলক বিশ্বজগৎ ইত্যাদি। পজিট্রনের রূপটি প্রকাশ করতেও বিজ্ঞানীকে রূপকের সহায়তা নিতে হয়, বলতে হয়, 'সমুদ্রে যেন বা মুষ্ট্যাঘাতের ফলে গহ্বর সৃষ্টি, তদ্দণ্ডেই তার লয়—পজিট্রন অনুরূপ'! প্রথম আণবিকবোমা বিস্ফোরণ দর্শনে বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার চমকিত হয়ে গীতার বিশ্বরূপদর্শনের একটি বিশেষ শ্লোক স্মরণ করেন।

যেহেতু আমরা কেউ নিরাসক্ত নই, এবং প্রত্যেকের মনই যখন সামান্য তলটি বাদ দিলে অনেকখানিই আলাদা তখন আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিক্রিয়াও অনেকখানি আলাদা হতে বাধ্য। অবশ্য সমজাতীয় প্রতিক্রিয়া হতে বাধা নেই। অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন ইনসটিংট প্রভৃতির প্রাবল্য অথবা আদর্শজাত সমমাত্রিকতা মনের কাজকে অনেকখানি আবিষ্ট ও প্রভাবিত করে রাখে, তখন। একই বিষয় বিভিন্ন মনে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নদিক থেকে বিভিন্ন রূপপরিগ্রহ

করে। আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও যে কেবল প্রকট যুক্তিই কার্যকরী হয় তাও নয়। প্রসঙ্গতঃ আর্থার কোয়েশলারের 'স্লিপ ওয়াকারস' গ্রন্থটি মনে পড়ে যায়। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পঁয়কার তাঁর একাধিক আবিষ্কারের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'sudden illuminations to the unconscious working of the mind'-এর কথা বলেছেন। এমন কি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার যে একটিই স্বতঃসিদ্ধ পন্থা থাকে তাও নয়, পরস্পর নিরপেক্ষ পন্থাও থাকে। কার্ল মার্কস ও আলেক্স ড তকোভিল পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবেই ভারতের ইংরাজশাসন-পূর্ব সমাজ এবং ইংরাজ শাসন সম্পর্কে অনেকগুলি কাছাকাছি সমসিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

আবার পদার্থবিদ্যায় যতটা গণিতের ভাষা কার্যকরী, জীববিজ্ঞানে ততটা নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। কেননা জীবন কিছু ফর্মাল সমীকরণাশ্রয়ী নয়। অথচ অর্থনীতিতে গণিতের ভাষা প্রয়োগসিদ্ধ। যদিও পূর্বে কিছু হাইপথিসিস-মডেল ইত্যাদি মেনে নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এ-ব্যবহারের পরিধিও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। আমাদের ব্যবহারিক জগতেতো বটেই, অন্যান্য শাস্ত্র ব্যাখ্যায় গণিতের ভাষা অথবা গণিত কোনো লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপকরণ মাত্র, নিজেই লক্ষ্য নয়।

গণিতের ভাষা অবশ্যই অন্যতম ভাষা যদিও, তথাপি তা পূর্ণ ভাব প্রকাশের বাহন নয়। সে বিচারে পুরো ভাষাও নয়। কেননা, আবেগ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিঅস্তিত্ব বা মন যখন অসম্ভব, তখন আবেগলাঞ্ছন ভাষার স্বীকৃতি সর্বাংশেই স্বীকার করতে হয়। আর তাই ভাবপ্রকাশের রূপকনির্ভর বাহন, অর্থাৎ শব্দকে মেনে নিতেই হবে। সে বিচারে ভাষা-যথা-কবিতা এবং ভাষা-যথা-বিজ্ঞান এদের মধ্যে তফাৎ করা অবিজ্ঞজনোচিত। আমাদের তাঁই অর্ফিয়ুসেরই উপকথায় ফিরতে হলো। অর্থাৎ সুরসমন্বিত ব্যঞ্জনায়, মানবিক বোধসমূহ প্রকাশ করার একমাত্র বাহন যে শব্দই—এ কথা বলায় আর বিন্দুমাত্র প্রমাদ নেই।

ভাষা যে জীবন্ত অনুষঙ্গের প্রতীক হয়ে আসে তা আমরা কিছু কিছু শব্দ ব্যাকরণে ব্যবহারের ফলে জেনেছি, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মন ও শব্দের ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কে এলিজাবেথ সীওয়েল প্রশ্ন তুলছেন, বলেছেন, 'fertile', 'pregnant of ideas', 'to conceive' প্রভৃতি শব্দে দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যেকার রহস্যও কি অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে? আওয়েন বারফিল্ডও বলছেন "There is a strong tendency in the Greek language....to make itself felt as a living, muscular organism rather than as a structure; and it is quite in harmony with this that the terminology of grammar, most of which is derived from the Greek should have originated in so many cases as physical and physiological metaphor (Poetic Diction pp 98)" অর্থাৎ ভাষা ও মানবিক প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও ভূমিকা গভীর ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

গণিতের ভাষা পুরোপুরি এই সম্পর্ক বিরহিত, এবং কাল-নিরপেক্ষ। গণিতের ভাষায় অর্থাৎ ডিসএম্বডিড ল্যাঙ্গুয়েজে চিন্তা করা পুরোপুরি সেই অর্থে অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ধারণালাভ, সে ধারণাগুলিকে শব্দে প্রতীকগত রূপান্তরণ, সমাজে যোগাযোগের বাহন করে স্মৃতিমঞ্জুষা গড়ে তোলা, পরিশেষে অভিজ্ঞতাকে উত্তরাধিকারে উত্তীর্ণ করে রেখে যাওয়া—এই তাৎক্ষণিক ও কালোত্তীর্ণতার মধ্য দিয়ে মানব শরীর, ইন্দ্রিয়, শব্দ, ব্যাকরণ, উত্তরাধিকার, সব কিছু সমস্ত কিছু মিলে যায় এক আবহমানতায়। মানবশরীর ও ব্যাকরণ যেহেতু গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত, সে মূল্যে কবির ভবিষ্যবাণী ও বিশ্ববোধ এবং বিজ্ঞানীর আবিষ্ক্রিয়া ভাষায় একই শিকড়ে ধরা রয়েছে। সুতরাং কবি বিজ্ঞানবিরহিত, এবং বিজ্ঞানী কাব্যবিরহিত—এই দ্বিঘাত বৈপরীত্যটি চূর্ণ করবার জন্য এই শতকের বিশদশক থেকেই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মিডলটন

মারে, মাইকেল পল্যানি, হারবার্ট রীড, রেবেকা ওয়েষ্ট অনেকের নামই এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। বিজ্ঞান ও কাব্য তাই 'ছুটি পক্ষ একই আকাশগামী ছুটি পঙ্‌ক্তি মিলে একই পয়ার'। ওপেনহাইমারের কাব্যপ্রীতি, বার্ণালের সংস্কৃতি-সমাজ-সমাজতন্ত্রবিষয়ক সিদ্ধান্ত, হালডেনের কাব্যমনস্কতা-কবিতারচনা-রূপকথাগ্রন্থপ্রণয়ণ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিজ্ঞানীদের রূপকময় ভাষা এবং কবিতার শক্তির প্রতি প্রবণতা দেখিয়ে দেয়। গণিততাত্ত্বিক রাসেল বা হোয়াইটহেড রসজ্ঞ বলেও কম যান না।

যখন বিজ্ঞানচিন্তা অপুষ্ট, শিল্পজ্ঞান অপরিপূর্ণ তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানধারার স্নাতক-ডিগ্রী পাওয়া যুবকের নিকটে রবীন্দ্রনাথ হিব্রুভাষা সদৃশ এবং মানবতত্ত্বের কোনো বিভাগে স্নাতকডিগ্রী পাওয়া নবযুবকের নিকটে গণিতশাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যার ক খ গ ল্যাটিনভাষা স্বরূপ। সি. পি. স্নো বিজ্ঞানসংস্কৃতি ও মানবতত্ত্বের সংস্কৃতির বৈপরীত্যের ফলে আজকের ছুনিয়ার সর্বনাশা ছু-সংস্কৃতির পরস্পরনিরপেক্ষ জগতের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই সংস্কৃতি-বিভাজন সমস্যাটির উপরে অনেকখানি আলোকপাত করেছেন।

বিজ্ঞান ও কবিতা, বিজ্ঞানশিক্ষা ও মানবতত্ত্ব—উভয় বিদ্যার ঐক্যময় সামঞ্জস্যের মধ্যেই আছে আগামীকালের মানুষের সংস্কৃতি। আজকের দিনে কবিতাপাঠে অনাসক্তি অথচ ফলিত বিজ্ঞানেব প্রতি মাত্রাধিক ঝোঁক, সমাজের সাংস্কৃতিক ভারসাম্যহীনতার রূপটি দেখিয়ে দেয়। সত্যিকারের উন্নত মানবসমাজের জন্য অপেক্ষায় আছে সেই ভারসাম্য, যে সমাজে 'বিশ্বের কবিতা মৃত্যুঞ্জয়' হয়ে থাকে। যেখানে অর্ফিয়ুস মৃত্যুহীন।

কবি এবং বিজ্ঞানী উভয়েই চান বিশ্বজগতের সত্যকে প্রকাশ করতে। লক্ষ্য এক, কিন্তু পন্থা বহুতর। সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে না বলেই, শব্দকে এমন ভাবে যাদুকরের মতো সাজাতে হয় যাতে যা বুঝেছি এবং যা বুঝছি তার মধ্যের ফাঁকটি পূরণ করা চলে। সে জন্যই উপমা, রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতি ব্যবহার করতে হয়। ফরাসী সিম্বলিষ্টরা যেন ভাষার অপরিপূর্ণতার কথাটি ভেবেই সুন্দর বলতে বিষণ্ণতা ও রহস্যময়তার সমন্বয় বলে বুঝতেন। বলতেন, ভাষার শিকড়ে, একেবারে আদি উন্মোচনে যেতে হবে।

সমস্ত প্রত্যঙ্গের লক্ষ্যানুযায়ী ক্রিয়ার মধ্যদিয়ে মানুষের মনের নির্দেশ প্রকাশ পায়। তবুও মন ও অস্তিত্ব প্রত্যঙ্গের উর্ধে। প্রতিটি প্রত্যঙ্গকে ঝকঝকে তকতকে রাখলেই জীবের পুরো গৌরব বোঝায় না, পুরো গৌরব বোঝায় তারও উর্ধে, জীবটির আচরণে এবং চারিত্র্যে। অনুরূপ উদাহরণ অনুযায়ী আমরা বলতে পারি বহু ক্ষেত্রে শব্দবিন্যাসের স্বচ্ছতা, উপমা-রূপক-চিত্রকল্পের ঝকঝকে প্রয়োগ কবিতাকে এত বেশি স্বচ্ছকাচবৎ করে তোলে যে, তার পরে কবিতার কথাটিই ভুলতে হয়। রহস্যের গ্রন্থিমোচন করার মধ্যে পাঠকের যে আনন্দ, এ কবিতার মধ্যে তাতো পাবার নয়। সমস্তটাই তার বিবৃতি। যা জানি তারই কথা। যা জানিনা তার ইঙ্গিতে নেই কোনোখানে। কবিতা তখন আর কবিতা না হয়ে বক্তৃতা হয়ে যায়, কিংবা হয় সংস্কৃত ভাষায় যেমন কবিরাজের পাঁচন তৈরির পদ্ধতি বিষয়েও শ্লোক আছে—ঠিক সেই রকম।

সম্পূর্ণকে ধরা যাবে না, তবু ধরবার আকুতিতেই কবিতার সূচনা, শব্দেরও উন্মোচন। যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন :

তাই, শেষ সাধ
মোর সর্বশেষ আর প্রিয়তম ঈপ্সা ! যেন শেষে
তৃপ্ত হই কোনো এক দর্শনের সত্যের সঙ্গীতে
জীবন যা প্রতিদিন প্রার্থনায় নিয়ত আনত,
আবেগে ধ্যানের মধ্যে মানুষের হৃদয় নিভৃতে
গভীরে যাহার উৎস, মৃত্যুহীন সুচির কবিতা
গভীর জ্ঞানের বৃন্তে বাঁধা রবে অর্ফিয় বীণায়।

ঘটমানের ঊর্ধে সত্যকে ধরবার আকুতি শ্রমশিল্পজাত সভ্যতায়, আমরা প্রথম পেলাম যেন ওয়ার্ডসওয়ার্থে। আরও পাওয়া যাবে অত্যন্ত স্পষ্ট করে ১৯২৩ সালে লেখা রিলকের অর্ফিয়ুস বিষয়ক সনেটগুলিতে। শব্দের মন্ত্রমুগ্ধকরণের সেই আদিম ক্ষমতাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'সত্যের সঙ্গীত'। কী ভাবে ধ্বনি এসে মনকে আবিষ্ট করে তা রিলকে সনেটগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করলেন। শেলীও বলেছিলেন 'মুক্ত প্রমিথ্যুস'-এ 'ভাষা হলো চিরন্তন অর্ফিয় সঙ্গীত'। এবং রিলকে বললেন "যেখানে বড় বড় নামের মিছিল, কবি সেখানে কোনও কাজে আসেন না......তিনি তো শুধু একটিই বিষয়, তিনি হলেন কবি ; এবং কেননা চূড়ান্ত বিচারে, কেবল একজন, সেই অনন্ত এক—যে এখানে-ওখানে সমস্ত যুগ হয়ে যে শক্তি তাঁর নিজের অধীন, সেটাই তিনি সজোরে ঘোষণা করে চলেছেন।"

অনন্তকালের মিছিলে কবির অনন্ত নামাবলী, কিন্তু সর্বনামগ্রাসী একটিই চিরকবির নাম, তিনি অর্ফিয়ুস। তিনি আত্মধ্বংসেও গায়ক থাকেন, শব্দ যাঁর শরীর, এবং শব্দসুরের সমন্বয় তাঁর সত্তায়। ভাষাই সেই অর্ফিয়ুস। ভাষাই তো কবিতার মূল, ভাষাই একধরনের কবিতা। মানুষের বিশ্বজগতে স্থান কোথায়,—সেই প্রসঙ্গেই হয় শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্ম। কবিতার মূল শিকড় রয়েছে স্মৃতিময় শব্দের মধ্যে। রয়েছে মহাকথার মধ্যে—যে মহাকথা মানুষ যা হয়েছে আর মানুষ যা হতে চায় সেই উভয়ের ফাঁকটিকে ভরাট করে তুলেছে কল্পনায়।

সে-কল্পনাকে কার্যকর বাস্তবে রূপ দিয়েই তো মানবযাত্রা, সৃষ্টি, অন্বেষণ ও বিপ্লব।

১৮০২ সালের লিরিক্যাল ব্যালাডসের সংস্করণের ভূমিকায় (কোলেরিজ বলছেন, ভূমিকাটি মূলতঃ তাঁরই মাথা থেকে এসেছিল, তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাতে বেশ যোগবিয়োগ করেছিলেন) বলা হয়েছে, বিজ্ঞান যে সূত্রগুলি রেখে আর এগোবে না, মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, এবং প্রকৃতির জীবজগতে সর্বাপেক্ষা জটিল ও অত্যাশ্চর্য দান—ভাষা, সেই ভাষাতে সেই তত্ত্বে রক্তমাংস লাগে, ফলে কবিতা ও বিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে বিশ্ব-আবিষ্কারে বেরিয়ে পড়ে। If the time should ever come when what is now called science, thus familarised to men, shall be ready to put on, as it were a form of flesh and blood, the Poet will lend his divine spirit to aid the transformation, and will welcome the Being thus produced, as a dear and genuine inmate of the "household of man."

১৭৯৭ সালে কোলেরিজ তাঁর ঈপ্সার কথা বলেছিলেন: "২০ বছরের কম সময় যেন একটি এপিক লেখবার সময় হিসাবে না মনে করি। দশ বছর লাগবে বিষয়বস্তু আহরণ করতে। মনকে স্থায়ী বিজ্ঞানের জ্ঞানে তপ্ত করে নিতে হবে। হতে হবে কাজচালানো গোছের গণিতজ্ঞ—সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হবে বলবিদ্যা, অচর জলবিদ্যা, আলোকতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদতত্ত্ব, ধাতুর্বিদ্যা, জীবাশ্মতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, শরীরশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা। অতঃপর মানুষের মন জানতে পড়তে হবে ভ্রমণ-কাহিনী, সমুদ্রযাত্রার গল্প ও ইতিহাস। এভাবে দশ বছর কাটাবার পর, পরের দশ বছর কবিতাটি লিখব, এবং বাকি পাঁচ বছর কবিতাটির সংস্কার করব। এভাবেই আমাকে লিখতে হবে, কানে আসবে স্বর্গীয় এবং যথার্থ স্বরের ধ্বনি অতি মৃদুভাবে—যে ভাষা পূর্বনির্ধারিত চিরমন্দার মাল্যে

সাজিয়ে মহান্ হৃদয়কে নক্ষত্র-প্রদীপ্র ধ্বনি শোনায়।" কোলেরিজ অবশ্য এ আরব্ধ কাজ কার্যকর করতে পারেননি নিজে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যার কথা (১৭৯৮ সালে লেখা), ১০৭ পঙ্ক্তির দি এক্সকারশনে প্রথমেই বলেছেন কবিতা হোক ভ্রমণ :

মানুষে, নিসর্গে আর মানব জীবনে

সঙ্গীতে নীরবে।

বিশ্বজগতে মানুষের স্থান এবং বিশ্বজগত ও জীবনের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অন্বয়ই কবির অন্বিষ্ট। ছন্দোবন্ধে তিনি সমস্ত কিছুকে ঐক্যে মিলিয়ে নেন। বোধ হয় এজন্যই রিলকে স্ত্রী-কন্যা বর্জন করে ভ্রাম্যমান হয়ে সব সময় ভাবছিলেন—সেই "বিষয়গুলি যারা নিজেদের প্রকাশ করে বাধাহীনভাবে ও পরমভাবে।" ১৯০৩ এবং ১৯০৪ সালে রিলকে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন তিনি নক্ষত্র, ফুল ও জীবজগত সম্পর্কে কিছুই জানেন না মনে করে, ভাবছেন "বই পড়তে হবে প্রকৃতিবিজ্ঞানের আর জীববিজ্ঞানের, শুনতে হবে বক্তৃতা, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে অধ্যয়ন করতে যেতে হবে—ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব, জীববিদ্যা, পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব, কিছুটা মানব-শরীর-বিদ্যা।"

রিলকে বিশ্বাস করতেন মানুষ ও প্রকৃতির গভীরতম সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মিলনে। কবিকে মহৎ হতে গেলে, বিশ্বস্পন্দনকে ধরার মতো চৈতন্য স্বরূপ চিদানন্দ হতে হলে, ব্রহ্মাস্বাদসহোদর অনুভব পাঠককে পৌঁছে দিতে গেলে—শব্দের সেই অমোঘ ধ্বনিতন্ময়তা ও মন্ময়তায় যেতে হবে—যেখানে ধ্বনির রহস্যে বিশ্বজগৎ স্পন্দিত।

বিশ্বজগতে প্রতিটি বস্তুই বিভিন্ন দ্রুতি বা ফ্রিকোয়েন্সিতে স্পন্দিত। সেই স্পন্দনই ধ্বনি। ধ্বনি বিশেষরূপে প্রকাশিত হলে ছন্দ নিরূপিত হয়। সেই ছন্দই ইলেকট্রনের নর্তনে, নদীর তরঙ্গভঙ্গে, শ্বাস-বায়ুর উত্থানপতনে, নক্ষত্রনিকরে গ্যাস বিস্ফোরণে, শক্তি-বিকীরণে, পত্রের ক্রমোন্মোচনে, ফুলের প্রস্ফুটনে···ইত্যাদি ইত্যাদিতে সদাজাগর অবস্থায়

রয়ে গেছে, যা বিশ্ববীণার তারে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচিয়ে চলেছে; ছন্দ তাই কণ্ঠস্বরকে অমোঘ রূপদান করে।* ছন্দস্পন্দিত শব্দই গড়ে তুলেছে মানুষের ভাষাকে। স্পন্দিত ভাষা গড়ে তুলেছে কবিতাকে।

যে জাতি যত সভ্যতার উন্নতিতে এগিয়েছে, সে জাতির শব্দ ভাণ্ডারও তত বিশাল। সভ্যতার বিকাশ মানেই মানবমনের প্রচুর কর্ষণজাত সমৃদ্ধি। ব্যাপ্ত অনুভবের এই মানবিক ভূগোলে দিঙ্‌নির্ণায়ক তাই উপযুক্ত শব্দাবলী। এবং শব্দই আদিম যুগ থেকে আগামীযুগ পর্যন্ত একমাত্র মনের ত্বরিত গমন-প্রত্যাবর্তনের অনন্য সেতু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সম্মিলিত ঐক্যে মেলাবার জন্য ভাষার যাদুস্পন্দনের প্রচেষ্টাই অর্ফিয় অনুশীলনী। এবং তারই অন্য নাম কবিতা। জৈব অস্তিত্ব থেকে মানবিক অস্তিত্ব যেমন জীবমানুষের উদ্‌বর্তিত হয়ে চলেছে শ্রমের তাৎপর্যে, তারই পাশাপাশি সেই মহান পরিক্রমায় স্বাধীনতার পথে ক্রমোত্তরণ ভাষার দাক্ষিণ্যেই সম্ভব হয়েছে। ভাষাই এই বিচারে মানুষকে 'মানুষ' করেছে। ভাষার নেই আর্থনীতিক শ্রেণীভিত্তি, ভাষা নয় কোনো আর্থনীতিক ভিত্তির উপরে রচিত সুপারস্ট্রাকচার—ভাষা শ্রেণী-সমাজের দ্বন্দ্বের ঊর্ধে যুগযুগান্তব্যাপী প্রসারিত একই সেতুবন্ধ। সে সেতুতে দাঁড়িয়ে আমরা অনাদি বিগত ও অনন্ত আগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। এমন কি বহির্দেশীয়, অথচ শাসিত দেশে বসবাসকারী শাসকগোষ্ঠীর ভাষার যেটুকু সামান্য-ভাষায় গ্রাহ্য হয়, সেটুকুই জীবিত রয়ে যায়। বাকি অংশ চলে যায় ভাষাপণ্ডিতের ধ্রুপদী ভাষা চর্চায় অথবা বিস্মৃতিতে।

আমরা পূর্বের নিবন্ধের সূত্রপাতেই বলেছি মন গর্ভধারণের মতো শব্দ ধারণও করে। রিলকের নিকটে ইউরিডাইস সেই নারীস্বরূপ, যে গর্ভে অতীতকে ধারণ ক'রে বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যতে সন্তান

জন্ম দেবে। মৃত্যুতে কোনো কিছুর বিলোপ হয় না, এবং মৃতদেহ জননী বসুন্ধরা গর্ভে ধারণ ক'রে একদা গর্ভমুক্তিতে ফুলফল-পাদপ-ওষধির জন্ম দেয়।

সুরের বিভিন্ন ভূমিকা রিলকে তাঁর সনেটগুলিতে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন প্রথম সনেট :

বৃক্ষটি দাঁড়াল স্থির—সুনিবিড় সান্দ্র উচ্চারণ
অহো, অর্ফিয়ুস গায়! কর্ণ মধ্যে বৃক্ষ জায়মান!
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ হলো। কিন্তু নতুন ক্রমণ
সেই স্তব্ধতায় ছিল, আবেশ ও গঠনে মহান।

নৈঃশব্দে, অরণ্য পত্রছায়া গুহানিগূঢ় নিভৃতি
সরিয়ে দাঁড়াল হিংস্র শ্বাপদেরা মৌন উন্মুখর—
নির্ভয়ে চৌদ্দিকে, হলো নব আবিষ্কারে পরিচিতি
হিংস্র ওরা নয়, ওরা যথার্থই কল্যাণসুন্দর।

অন্তত শোনার জন্য। হুহুঙ্কার, নির্ঘোষ, গর্জনে
হৃদয় এলোনা সেজে। তেমন হৃদয়ে ঠাঁই নেই
যাতে নিতে পারে সুর ঘরে, ঘর নিতান্তই কুঁড়ে

অন্ধ তৃষ্ণা গাঁথা, আছে সেখানে শায়িত অন্তঃপুরে
নতজানু হয়ে, কিংবা ভাঙা ঝাঁপ, ভীরু কম্পনেই
মন্দির তুলেছ গড়ে ওদেরই ইন্দ্রিয়, শ্রবণে॥

বলাবাহুল্য উদ্ধৃত সনেটটিতে কবিতার মর্ম উন্মোচনকারী ক্ষমতাটি বিবৃত করা হয়েছে। চলচ্ছক্তিরহিত বৃক্ষাদি থেকে, শ্বাপদেরাও অর্ফিয়ুসের সঙ্গীতে মুগ্ধ। এবং কর্ণকে মন্দিরসদৃশ করে, স্বর্গীয় সঙ্গীতের দেবরূপে প্রবেশ ঘটল সেখানে। রিলকে এই সুরধারণকে গর্ভধারণরূপ বলে বর্ণনা করছেন। কখনও-বা পুরুষ-নারীর সম্মোহিত সম্মিলন বলে তা ব্যক্ত

করা হয়েছে। আবার ইউরিডাইসই যেন পূর্ণ সঙ্গীত বা ভাষা। যমগৃহে আমরা ইউরিডাইসকে গর্ভবতী দেখি—জঠরে মৃত্যুবহন করছে সে।

সব কিছুরই ছিল অস্তিত্ব তার মধ্যে : অরণ্য আর প্রান্তর
পথ আর ছোট গ্রাম, চষা মাঠ আর স্রোতস্বতী আর পশু
আর এই শোকের বিশ্বের বাইরেরও যা কিছু, সে সবই ঘুরে দাঁড়াল,
আরেক পৃথিবীর চারদিক ঘিরে, এক সবিতা
আর নক্ষত্র খচিত এক নিঃশব্দ আকাশ
অশ্রুকলঙ্কে ম্লান এক আকাশ শোক
সে, তখন এতখানি প্রেমস্পদা···
··নিজেকে নিয়ে সে মগ্ন হয়ে চলেছে। আর তার মৃত্যুময়তা
যেন তাকে পূর্ণতায় ভরিয়ে দিয়েছে।
যেন সুমিষ্ট সেই ফল ভরা আর ছায়াচ্ছন্নতায়
সে ছিল তার মহান মৃত্যুতে লীন
···সে অর্জন করেছে এক নতুন কৌমার্য
আর সে তখন সন্দহিান ; তার যৌনতা
সন্ধ্যাসমাগমে তরুণী কুসুমের মতো মুদে আছে
···সে তখন খুলে গেছে দীর্ঘ কেশরাশির মতো
ছড়িয়ে গেছে দূরে সুবিস্তারে বৃষ্টিপাতের মতো
বহু উৎসারের মতো সে ছড়িয়ে দিয়েছে আপনাকে।
···সে তখন কেবল শিকড়
···তার পদক্ষেপে জড়িয়ে ধরছিল কবরের বস্ত্রখণ্ড
অনিশ্চিত, স্নিগ্ধ, ধৈর্যের প্রতিমা ॥ (অর্ফিয়ুস। ইউরিডাইস। হার্মিস।)

সকল নারীই অবশ্য রিলকের নিকটে ইউরিডাইস :

নারীরা পুষ্পিত গভীরে পৃথিবীর
সর্ব শিকড়ের অতীব প্রিয়জন
ইউরিডাইসেরই সকল নারী বোন।

দ্বিতীয় সনেটটিতে নারীকে পুরুষের গভীর সম্মোহনে নিদ্রিত দেখা গেল। রিলকে অন্য এক জায়গায় বলেছেন, পুরুষ ও নারীর যেখানে 'মনে' মিলন ঘটল, সেখানেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! নারী এই দ্বিতীয় সনেটে সঙ্গীত, এবং সে যেন পুরুষের সঙ্গে আসঙ্গবিলাসে নিদ্রিতা, যেনবা মানসরমণে বেপথুমানা। নিদ্রারই আরেকটি রূপ মৃত্যু। রিলকের মতে তাই মৃত্যু বিনষ্টি নয়। এই দ্বিতীয় সনেটটির অংশবিশেষ :

এবং নিভৃতি থেকে কী উচ্ছ্রিত—যেন বা কিশোরী,
বীণা ও গানের ঐক্যে অবিভাজ্য আনন্দ—আনন্দ,
বসন্তকালীন ঘোমটা বেয়ে তনুমুক্তার স্বাচ্ছন্দ্য
এবং শায়িতা হলো সে এসে আমার কর্ণোপরি।

এবং আমার মধ্যে ঘুম যায়—নিদ্রা সে স্মরণ
সেই বৃক্ষরাজি আমি রহস্য ভেবেছি যাহাদের
প্রান্তরের শেষ, বোধগম্যতা যা অতি দূরান্তের
এবং একান্ত কাছে—প্রায়শ একাত্ম বিচরণ।

ঘুমে তার বিশ্ব। ওহে গায়ক দেবতা বলে দাও
কি ভাবে গড়েছ তাকে তিলোত্তমা, বেছে নিলে না কী
জাগরণ? প্রারম্ভেই শরীরিণী, অতঃপর ঘুমে!

তারপরেই রিলকে প্রশ্ন করছেন : 'কোথায় তাহার মৃত্যু? বলে দেবে তা কী'? রিলকে মরণে অবিশ্বাসী নন, কেননা তিনি জীবনে বিশ্বাসী, তিনি জানেন স্তব্ধতার অবসানে, স্তব্ধতারই গর্ভমুক্তিতে ভাষার প্রকাশ। মৃত্যু গর্ভমন্থর নিদ্রামাত্র। যেমন সপ্তম সনেটে কফিনটি অবশেষে স্তব্ধতা শিখেছে :

ওষ্ঠাধর-মুক্তি যেন অবশেষে জানে
স্তব্ধতার মানে।

জীবন ও মৃত্যু একই মুখে উচ্চারিত,

ফুল, দ্রাক্ষাপত্র, ফল—এই নিয়ে রই কর্মরত,

ওদের ভাষাতো নয় শুধু এই বৎসর-সম্মত।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তারা পথ করে নেয়। অজস্র পূর্বপুরুষের চিতাভস্মে মৃত্তিকা পৃথুলা হয়। যেন মৃত্যু। পিতৃপুরুষ-মাতৃরমণীর রমণে মৃত্তিকার মধ্য থেকে অঙ্কুরিত হয় নতুন চারা, পরে ফুল, লতাপাতায় মুক্তি নিয়ে আসে—স্তব্ধতা শেষে যেন-বা ভাষা। পঞ্চদশ সনেটে তাই পাওয়া যায়:

যা কিছু জন্মে অন্ধের মতো
তাদের নিহিত মানে
প্রাজ্ঞতা, যিনি নিম্নে, সতত
শিকড় সন্নিধানে।

শিকারীর শিঙা, যোদ্ধমুকুট
করাৎ প্রাচীন জ্ঞানে—
ভ্রাতার জন্মে পুরুষের কূট,
নারী বাঁশরীর টানে।

শরোন্মোচন, আরও বাণ, কই
মুক্তি করে না চেনা
হাঁ, জাগে ঊর্ধে, ঊর্ধে সে ঐ
দ্রুত দংশনে সে যে যায় চলে
কেবল ঊর্ধে রয় জ্বলজ্বলে
বাঁকা রেখা; সে তো বীণা।

নারীকে এই সনেটটিতে বাঁশি ও বীণায় উপমা দেওয়া হয়েছে, যে বীণা অর্ফিয়ুসের করকম্পনে সুরের সুরধুনী প্রবাহিত করে।

তারপর অর্ফিয়ুস-মীথের সমাপ্তিতে রিলকে আমাদের পৌঁছে দেন:

যে তুমি পূজায় ছিলে, শেষাবধি উদ্যত প্রহার
ঘেরে মীনেডেরা, তবু ঘৃণা করো আঘাতে উত্তর,
সুন্দরের রূপে করো পরাহত ভয়াল চীৎকার
ধ্বংস থেকে বেজে ওঠে গঠনের সুর. সপ্তস্বর।

বীণা আর শির মৃত্যুহীন ছিল হন্তা জনতায়
তাদের ক্রোধেব শীর্ষে লড়ে ওরা, অঙ্গারিত হয় ;
যে সব প্রস্তর হানে বক্ষে তবু তীক্ষ্ণ, রূপ পায়
অঙ্গ যেই স্পর্শ করে—মৃদু হয়—শ্রবণে তন্ময়।

প্রতিশোধে লুব্ধ ওরা, শেষে করে তোমাকে শিকার,
তবুও প্রস্তরে কিংবা সিংহে ফেরে ধ্বনি, প্রতীক্ষায়
ফেরে দ্রুমে ও বিহঙ্গে। তুমি আজো যেখানে ঝংকার!

তুমি দেব, বিলুপ্ত-যে—সকল সূত্রের সংখ্যাতীতে
ঘৃণা ছিন্ন করে অঙ্গ, চতুর্দিকে রেখেছে ছড়ায়ে
ঐ মুখ, শ্রোতা যার আমরা যথার্থ, প্রকৃতিতে॥

সমস্ত বিশ্বজগতের একদিকে রয়েছে নক্ষত্রপুঞ্জ—অর্ফিয়ুসের বীণা, অপর কোটিতে আছে মানুষের মন। উভয়ের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির ভাবনাতীত রূপ। অর্ফিয়ুস কাহিনী তাই শেষ হলো বিশ্বজগতের সেই ঐক্য বর্ণনা করে, দূরতম নক্ষত্রনিকর ও পৃথিবীতে মানুষের মনে রচনা করেছে ভাষা যে-ঐক্যের সেতুবন্ধ। সে ভাষা অর্ফিয়ুসের মুখস্বরূপ প্রকৃতিতে রিলকে ছড়ানো দেখেছেন। যার কোনও নাম নেই, যে চিরকাল, সেই কবির মাথা ভেসে চলেছে সময় পার হয়ে কবিতা ও চিন্তায়, পুনরপি কবিতায় চক্রায়ণে—যে গানের অতৃপ্তি কবির কোনো দিন মিটবে না।

মীথ ব্যবহারের মধ্যে তাহলে কি কোনো উত্তরণ আছে? পাভলব

দু-ধরনের সিগন্যালিঙ এর কথা বলেছিলেন। প্রথমটি হলো ইন্দ্রিয়গত সংবেদন। এযেন অনেকটা সম্পূর্ণের একটি অংশ। যেন আগুনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ধোঁয়া। দ্বিতীয় সিগন্যালিঙ মনুষ্যসৃষ্ট শব্দ। শব্দ আবার ধারণার একটি পূর্ণরূপ। ইন্দ্রিয় সংবেদনা ও শব্দগত ইঙ্গিত বা সিগন্যালিঙের পর আমরা যেন তৃতীয় একটি সিগন্যালিঙের পদ্ধতির কথা ভাবতে পারি। রজার গারোদি মীথ-প্রতীককে বলেছেন সেই তৃতীয় সিগন্যাল।

মানুষ কেমনভাবে মানুষকে গড়ে তুলছে, প্রকৃতিকে বদলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেও কেমন বদলে যাচ্ছে, আর এই বদলে দেবার কাহিনীকল্পটি ঘুমিয়ে আছে মহাকথার প্রতীকের মধ্যে। মহাকথার প্রতীক বিশ্বজগতের সঙ্গে মানুষের একটি বিশেষ সম্পর্ক নিরূপণ করছে। বাস্তবের ধারণাকে আরও প্রাণবন্ত করছে। মানবিত করছে মানুষের মলিন বাসভূমি, এই বিশ্বকে ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ক'রে। আমরা যেটুকু প্রকৃতির নিকট থেকে পেয়েছি বাস্তবতা তার চেয়েও বড়। এ অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্য আমরাই জন্ম দিয়েছি। এই দ্বিতীয় প্রকৃতি মানুষের কৃৎকৌশল ও শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে।

মহাকথা বা মীথের প্রতীক আমাদের পরমকারণ কোনো মহাসত্তায় বিলীন করে দেয়না, বরং আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে এক অনুপস্থিতি, এক শূন্যতা, যে শূন্যতা মানুষের শ্রম ও মানুষের মনীষাই পুরণ করবে।

ভাষার অমোঘ ক্ষমতাকে নিয়েই অর্ফিয়ুসের এই মহাকথা। বাল্মীকিও সেই ভাষারই বাণবিদ্ধ। কবিতার দেবী সরস্বতীও বীণা-বাদিনী, তাঁকে ঘিরে আছে জলস্থল অন্তরীক্ষ জড় ও জীবন। অর্ফিয়ুসের এই কাহিনী ভাষার চিরন্তন জয়ের ঘোষণা। যেখানে বিজ্ঞানী ও কবিতে কোনো তফাৎ নেই—তফাৎ কেবল উপকরণে। তাঁরা উভয়েই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের গ্রন্থিমোচন করছেন। চিন্তার উপায়স্বরূপ উভয়েরই আয়ত্তে আছে ভাষা। আবার ভাষাই এক অর্থে কবিতা—কেননা তা চিত্রকল্প, রূপক ও উৎপ্রেক্ষাময়॥

চিত্রকল্পের সেই বিস্মৃতপ্রায় আন্দোলন

ডি. এইচ. লরেন্স আমাদের দেশে অধুনা (১৯৬১) সংবাদ-শিরোনামায় জনপ্রিয় নাম। ওল্ড বেইলী তাঁর অসংক্ষেপিত লেডী চ্যাটার্লীর প্রেমিককে মুক্তি দিলেও বোম্বাই আদালত তাকে অন্তরীণ রাখবার আদেশ দিয়েছেন। উপন্যাসে সেক্স-কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন বলেই সাধারণ পাঠকসমাজে ডেভিড হারবার্ট লরেন্স-এর প্রসিদ্ধি। অবশ্য সুসংস্কৃত পরিবেশে লরেন্স তাঁর সাহিত্যজগতে পদক্ষেপের পর থেকেই বিশেষভাবে আলোচ্য। এবং তাঁর কবিতার বিষয়ে কৌতূহলেরও শেষ নেই। ডি. এইচ. লরেন্সকে চিত্রকল্পধর্মী (imagist) কবিদের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনারও চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁকে ইমেজিস্ট আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত জনৈক কবি বলে দেখা বোধহয় ভুল হবে। আসলে ১৯১৪ সালে লরেন্সকে এমন একজন প্রতিভাশালী যুবক বলে মনে করা হতো যে, ইমেজিস্টরা তাঁর কবিতাকে তাঁদের সঙ্কলনে স্থান দিয়ে মনে করতেন 'মহাপ্রতিভাধর এই লেখক ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে দারুণ খ্যাতির অধিকারী হবেন. আর এই সম্ভাব্য খ্যাতি ইমেজিস্ট আন্দোলনকেও দেবে গৌরব'। শ্রীমতী অ্যামি লাওয়েলই লরেন্সকে, তাঁর "The morning breaks like a pomgranate/In a shining crack of red" পঙক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করে বুঝিয়েছিলেন যে লরেন্সও আসলে একজন ইমেজিস্ট কবি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতা ইমেজিস্ট সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্তির দাবি করেন। লরেন্স এই অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ১৯২৯ সালের মে মাসে গ্রেন হিউগসকে বলেছিলেন যে তাঁকে ইমেজিস্ট বলে "চিত্রিত করবার জন্য মূলত দায়ী এজরা পাউণ্ড"। বলেছিলেন "হি ওয়াজ

অলওয়েজ অ্যামিউজিং। লণ্ডনের সেই পুরনো দিনে এজরা পাউণ্ডের আজকের মতো প্রতিষ্ঠা এতটা ছিলো না। তিনি তখন অনেকখানি হাতুড়ে বলেই পরিচিত ছিলেন। যতখানি যা প্রচার করতেন তার ঢের বেশি নিজেই তা ব্যবহার করতেন। কেননা তাঁর তখন কোনো শ্রোতাই ছিলনা ” পাউণ্ডের তৎকালীন চরিত্রের এই বিশেষ চিত্রণ অবশ্য বিতর্কসাপেক্ষ। সে যাহোক ১৯৩০ সালেও যে ইমেজিস্ট অ্যানথলজি প্রকাশিত হয়, তার কবিতালিকায় রিচার্ড অ্যালডিঙটন, জন করনস, এইচ. ডি. (হিলডা ডুলিটল), জন গোল্ড ফ্লেচার, এফ. এস. ফ্লিণ্ট, ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড, জেমস জয়স, উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়ামস্ প্রভৃতির সঙ্গে ডি. এইচ. লরেন্সকেও দেখা যায়। এবং ১৯৩০ সালেই ডি. এইচ. লরেন্সের মৃত্যু হয়।

লরেন্স ইমেজিস্ট আন্দোলনে ছিলেন কিনা এ নিয়ে তর্ক উঠলেও ইমেজিসম্ যে একদা একটি কাব্য-আন্দোলন ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও ত্রিশ বা চল্লিশের কোনো কোনো কবি সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এলিঅটের দিকে মুখ ফেরাতে, অনেকেই অজ্ঞাতে তাঁর পূর্বসূরি—যাঁদের সঙ্গে এলিঅটের পরবর্তীকালে কোনও সম্পর্ক ছিল না—সেই ইমেজিস্টদের, বিশেষভাবে 'ইমেজিস্ট' এজরা পাউণ্ডের বহু তৎকালীন মতামতকে মান্য করেছিলেন। এ সত্ত্বেও ইমেজিস্ট আন্দোলন আমাদের দেশে সুপরিচিত আন্দোলন বলে আমরা মেনে নিতে পারি না।

বস্তুত ইমেজিসমের ক্ষেত্রে প্রভাব ও স্ফূর্তির উৎস ছিল দুটি। ক্লাসিক্যাল প্রভাব এসেছিল গ্রীক, লাতিন, হিব্রু, চীনা ও জাপানি কাব্য থেকে। আধুনিকতার ছাপ এসেছিল ফরাসী কাব্য-আন্দোলন থেকে। যাঁরা ইমেজিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা যে সবাই একইভাবে প্রেরণা বা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তা নয়। স্পষ্ট রূপরেখা, চিত্রকল্পের স্পষ্টতা, স্বল্প ভাষণ, ইঙ্গিতধর্মিতা এবং পর্ব-মাত্রা মান্য করা পদ্য

ছন্দের অধীনতা থেকে মুক্তি প্রভৃতি সূত্রগুলি তাঁরা ক্লাসিক্যাল গ্রীক, চীনা ও হিব্রু কবিতা থেকে পেয়েছিলেন। ফরাসী প্রভাব তাঁদের নিও-ক্লাসিসিজমের অংশভাগী এবং নিঃসংশয় করে তুলেছিল। সেই সঙ্গে মতবাদ নিয়ে ফরাসীদের মতো হৈচৈ করবার পদ্ধতিটিও তাঁরা অনুপ্রেরণার মতো লাভ করেছিলেন। অবশ্য ইমেজিস্ট আন্দোলনের পূর্বসূরি যে ফরাসী প্রতীকতার আন্দোলন—সিম্বলিজম, এ কথাটিও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

প্রতীকতার বিষয়ে পরিচিতি দিতে হলে আমাদের ১৮৬০-এর দশকের দিকে ফিরে তাকাতে হবে, যখন কিছুসংখ্যক উদ্ধত তরুণ রোমানটিসিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফ্রান্সে পারনাশাঁ (Parnassion) গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। ফরাসী কবিদের স্বভাবটাই একটু কুঁদুলে। কোনো মতবাদ নিয়ে লড়াই না করা পর্যন্ত তাঁদের স্বস্তি হয় না। ১৮৬৬-১৮৭৬, এই দশ বছরের পারনাশাঁগোষ্ঠী রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে Le Parnasse Contemporain নামে তিনটি কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করেন। যাঁরা এই সঙ্কলনের কবি, তাঁদের মধ্যে মালার্মে, ভের্লেন প্রভৃতি আমাদের দেশে অধুনা কিছুটা শোনা বা কোনো কোনো মহলে পরিচিত নাম।

এঁদের লক্ষ্য ছিল আঙ্গিকের অনিবার্যতা এবং অবজেকটিভিটি। বাস্তববিষয়গুলি তাঁরা বর্ণনামূলকভাবে যেমন প্রকাশ করতেন, তেমনি অন্তরঙ্গ দিকগুলি, বিশেষত আবেগকে তাঁরা অনুপস্থিত রাখতে বিশেষ করে সচেষ্ট থাকতেন। পারনাশাঁদের বাস্তবতার দিকটি অনেকের শেষ পর্যন্ত পছন্দসই হয়নি, ফলে প্রথম যুগের পারনাশাঁ-প্রবক্তা শার্ল বোদলেয়ারের দুজন শিষ্য ভের্লেন ও মালার্মে প্রতীকধর্মিতা বা সিম্বলিজমের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। প্রতীক ধর্মিতার মূলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আর্তুর র‍্যাঁবোও কম অনুপ্রেরণা ছিলেন না। সিম্বলিস্টরা অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা দৃশ্যমান বস্তুর অভিধাবাহী ভাষার

সাহায্যে প্রকাশ করতে চাইতেন। সুতরাং প্রতিটি শব্দই তাঁদের মতে ছিল প্রতীক। সাধারণ প্রয়োজনে নয়, বরং সংবেদনা বা অনুভবের উত্তরণে অন্যবিধ সত্য এঁরা ঐ শব্দসমাবেশে উন্মোচন করতে চাইতেন।

১৮৮৫ সালে জঁা মোরে সিম্বলিজম শব্দটি ব্যবহার করলেন। ১৮৮৫-১৯০০ পর্যন্ত ফরাসী কবিতায় সিম্বলিজম সবচেয়ে শক্তিশালী কাব্যাদর্শ ছিল। ইতিমধ্যে প্রতীকতার আন্দোলনের প্রবক্তাদের রচনা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। ফলে ১৮৯২ সালে জঁা মোরে ইস্তাহার বের করে ক্লাসিসিস্টদের একত্রিত করলেন। যাঁরা আরও র‍্যাডিক্যাল, তাঁরা কাব্যবক্তব্য ও আঙ্গিকের আরও অভিনবত্বের দিকে এগোলেন। এলেন কিউবিস্টরা (অ্যাপলনিয়-ম্যাক্স জেকব-আঁদ্রে স্যালম), ফ্যানট্যাসিস্টরা এবং ইউন্যানিমিস্টরা, দাদাবাদীরা (এঁদের মধ্যে ছিলেন ককতু, আরার্গ অনেকেই), তারপর অতিবাস্তববাদীরা—ইত্যাদি ইত্যাদি পালাক্রমে। ব্রেতঁ এবং আরার্গ অতিবাস্তবতা ও দাদাবাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিলেন।

ব্রিটেনে টি. ই. হিউমই (T. E. Hulme) আসলে ইমেজিস্ট আন্দোলনের নাটের গুরু। দর্শনগতভাবে নন্দনতত্ত্বের বিশেষ বিদ্যা, বিভিন্ন ভাষার কাব্যে পারদর্শিতা, বের্গসঁর সান্নিধ্য এবং আপন ব্যক্তিত্বের অস্থিরতা তাঁকে ইমেজিস্ট আন্দোলনের নেতা করে তুলেছিল। হিউম ১৯০৮-১৯১২ পর্যন্ত ব্রিটেনের তরুণ লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তাঁর মতামত ও আক্রমণ-কারী ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে হিউমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্যাকব এপস্টাইন বলেছিলেন: "দরকার হলে এক লাথিতে কোনো মতবাদ বা ব্যক্তিকে তিনি সিঁড়ির নীচে ফেলে দিতে পারতেন।" হিউম প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেন এবং ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিহত হন।

শ্রীযুক্ত এফ. এস. ফ্লিন্ট এই আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে

বলেছেন, "তখনকার দিনে যেমন ইংরেজি কবিতা লেখা হতো, (আর এখনো যা চলছে, হায়রে) তার বিরুদ্ধে অতৃপ্তিই এ গোষ্ঠীর একেবারে কেন্দ্রব্যক্তিদের এক সঙ্গে জড়ো করেছিল বলে আমার ধারণা। আমরা প্রস্তাব করেছিলাম একে ভর্স লিবর-এ বদল ঘটাতে। হিউম ছিলেন আমাদের সর্দার। তিনি চাপ দিতেন নিরঙ্কুশভাবে সঠিক পরিবেশনায়, অতিকথনদোষ থেকে মুক্তি লাভের প্রয়োজনে।" (ইগোইস্ট, মে ১৯১৫)

এজরা পাউণ্ড ২২শে এপ্রিল, ১৯০৯ সালে গোষ্ঠীটিতে যোগ দিলেন। পাউণ্ড তখন "was very full of his troubadours।" ১৯১২ সালে পাউণ্ড টি. ই. হিউমের সম্পূর্ণ কাব্যসঞ্চয়ন প্রকাশ করলেন—পাঁচটি কবিতা ও তেত্রিশ পঙক্তিতে। তার মুখবন্ধে লিখলেন : "As for the future, Les Imagistes, the descendants of the forgotten school of 1909....have that in their keeping।" ব্যস, ইমেজিসমের দল তৈরি হয়ে গেল। ইমেজ শব্দটির সংজ্ঞাগত অর্থও পাউণ্ড উপস্থাপিত করলেন। ইমেজিস্ট কবিতা কেমন হবে তার যোগ্য উদাহরণ যেন হিউম-এর এই কবিতাগুলি। হিউমের অধিকখ্যাত Autumn কবিতাটি উদ্ধৃত করা যাক :

A touch of cold in the autumn night—
I walked abroad,
And saw the ruddy moon lean over the hedge
Like a red-faced farmer.
I did not stop to speak, but nodded,
And round about were the wistful stars
With white faces like town children.

হিউমের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিতর্কের কারণ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তিনি একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করে গেলেন। আর এই আন্দোলনই ইংরেজি আধুনিক কবিতার সূত্রপাত ঘটাল। অ্যাংলো-

স্যাকসন কবিতার সঙ্গে আমাদের বাঙালি আধুনিক কবিতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, অন্তত আ-ডিলান টমাসতো বটেই। এলিঅট থেকে ডিলান টমাস। সেজন্যে আবশ্যিকভাবে ইংরেজ আধুনিক কবিতার জন্মকালের ইতিহাস আমাদের জানাও কম জরুরি নয়।

আমেরিকা থেকে হিল্ডা ডুলিটল১৯১১ সালে লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন। অ্যালডিঙটনকে দলে ডেকে নেওয়া হলো। দুজনেই ভার্স লিবর-এ কবিতা রচনা শুরু করলেন এবং মিত্রাক্ষর সমিল পঙক্তির মতো দুজনে অবশেষে বিবাহবন্ধনে মিলে গেলেন। ইতিমধ্যে ১৯১২ সালে চিকাগো ট্রিবিউনের হ্যারিয়েট মনরো চীন দেশে কবিতার সমাদর দেখে ফিরে এসে, উৎসাহিত হয়ে একশো জনের কাছ থেকে পঞ্চাশ ডলার করে চাঁদা নিয়ে ঐ বছরেই অক্টোবরে 'পোয়েট্রি : এ ম্যাগাজিন অব ভর্স' বের করলেন। পাউণ্ড তার বৈদেশিক প্রতিনিধি হলেন। ১৯১৩ সালে পাউণ্ড ঐ পত্রিকায় একটি গোষ্ঠী বলে পরিচিতি দিলেন ইমেজিস্টদের। ইমেজিস্টদের রচনায় নাকি এ-সব বিষয়গুলি আছে বা থাকতে হবে বলে পাউণ্ড বিধান দিলেন :

১। বিষয়টি বস্তুগত বা ভাবগত যাই হোক না কেন, তাকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করতে হবে। ২। রচনাটির পরিবেশনে যে শব্দটির নিরঙ্কুশভাবে অনিবার্যতা নেই, সে শব্দ বর্জন করতে হবে। ৩। ছন্দের ক্ষেত্রে, সাঙ্গীতিক বাগধারা পরম্পরায় রচনা করতে হবে, ছন্দস্পন্দনের (metronome) পরম্পরা অনুযায়ী নয়।

ফ্লয়েড ডেল চিকাগো ট্রিবিউনে কী কী ইমেজিস্টদের পক্ষে স্মরণীয় তার তালিকা দিলেন। যেমন :

যে সমালোচকেরা উল্লেখযোগ্য কিছু লেখেন নি, তাঁদের কথায় কান না দেওয়া।

যা ইতিমধ্যে ভালো গদ্যে লেখা হয়ে গেছে, নয়নভোলানো পদ্যের ছন্দোবন্ধনে তাকে সাধারণ কবিতায় রচিত করার কোনও প্রয়োজন নেই।

যত বেশি সংখ্যক বড় শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যায়, ততই ভালো, কিন্তু হয় তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা দরকার. নইলে গোপন রাখা প্রয়োজন।

বিশেষত আজ যা বিচার করতে ক্লান্তি বোধ হয়, আগামীকাল জনসাধারণ তার জন্য ক্লান্তি বোধ করবে।

কবি তাঁর মনে সুচারু শব্দসীমাসমূহ (cadenes) আবিষ্কার করেন, বিদেশী ভাষা থেকে আবিষ্কার আরও চমকপ্রদ কেননা শব্দগুলির অর্থ শব্দের গতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বলে মনে হতে পারে···গ্যেটের গীতি-কবিতাগুলিকে আবেগহীন শীতলতার সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করে তাদের অঙ্গীকৃত শব্দমূল্য, সিলেবল্‌গুলি হ্রস্ব, দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত নিস্পিষ্ট এবং মুক্ত স্বরধ্বনি ইত্যাদি বুঝে নিতে হবে।

কবিতা যে সঙ্গীতের উপর নির্ভর করবে এমন নয়, কিন্তু যদি তা কখনও নির্ভর করে, তবে যেন তা বিশেষজ্ঞকেও মোহিত করবার ক্ষমতা রাখে।

প্রতি পঙক্তি যেন পঙক্তি-সমাপ্তিতে একেবারে থেমে না যায়, পরবর্তী পঙক্তি যেন পূর্বের পঙক্তির ছন্দের তরঙ্গের উত্থানের সঙ্গেই উত্থিত হয়। অবশ্য কবি যদি কোনও বিলম্বিত স্তব্ধতা আনতে চান, সে হলো আলাদা কথা।

সঙ্গীতকার তাঁর অর্কেস্ট্রার স্বরতীক্ষ্ণতা বা পিচ এবং ধ্বনির গাম্ভীর্য বা ভল্যুমের উপরে নির্ভর করতে পারেন। কবিতার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কবিতার ক্ষেত্রে হার্মনি অভিধাটি অস্থানে প্রয়োগ মাত্র ; হার্মনি একই সময় বিভিন্ন স্বনতীক্ষ্ণতার ধ্বনির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক···যদি আনন্দ দিতে চায় তাহলে ছন্দে থাকতে হবে কিছুটা বিস্ময়ের উপাদানও···ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য উদ্ধৃত ব্যবস্থাপত্র এজরা পাউণ্ডেরই মতাদর্শের প্রতিধ্বনি। পাউণ্ড ইমেজ বলতে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা

অদ্যাবধিও বহুকথিত সেই সংজ্ঞা। "একটি বিশেষ মুহূর্তে চিত্রকল্প এক বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগঘন জটিলতার (complex) পরিবেশন করে··· তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশিত এই 'জটিলতা'র অবদান পৌঁছে দেয় এক ত্বরিত মুক্তির বোধে; মহৎ শিল্পে আমরা স্থান ও কালের সীমানা উত্তীর্ণ হবার যে চকিত বিকাশের বোধ পেয়ে থাকি এ বোধ সেই একই বোধ।" এবং "এক জীবনে একটি চিত্রকল্প রচনা করা মোটা-সোটা বইপত্র রচনার চেয়ে ঢের ভাল।" ইয়েটস্ অবশ্য এ ক্ষেত্রে বলবেন, "একমাত্র সত্যিকারের ইমেজিস্ট ছিলেন গার্ডেন অব ইডেনের পরমস্রষ্টা।"

বৃটেনে সাহিত্য আন্দোলনকে কেন-যে তাদের দেশের রাজার শাসনকালের সঙ্গে জড়িয়ে অভিধা দেওয়া তা বোঝা দায়। যেমন পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালের সঙ্গে সম্পর্কিত জর্জিয়ান অভিধাটি। ১৯১২ সালে এডোয়ার্ড মার্স-এর সম্পাদিত হয়ে বেরোয় জর্জিয়ানদের প্রথম সঙ্কলন। গতানুগতিক এই কবিদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এমন এক ধরণের বাস্তবতা বিরহিত নিসর্গ-চর্চা চলছিল যার সঙ্গে মনেপ্রাণে সুরমেলানো আর সম্ভব ছিলনা তরুণদের। ইণ্ডাষ্ট্রির সিটিস্কেপে যখন দেশ ছেয়ে যাচ্ছে তখন কোন পপলার কুঞ্জে গান শোনাবে idyllic ব্রজনিসর্গের নাইটিঙেল! ব্যক্তিমানুষও সে ব্যবস্থায় হয়ে পড়েছে পরমাণুসদৃশ; নির্দেশিত ও ব্যক্তিত্ববিহীন। এক গণ-সমাজ বা mass society-এর তারা নামহীন মিডিওকার এবং চাকার মধ্যে চাকার জ্ঞানবিরহিত—ম্যানিফেস্টো, প্রোগ্রাম ও বেতন হ্রাসবৃদ্ধির প্রতি মনস্ক গণতন্ত্রের ভোটার মাত্র।

ব্যক্তিত্ব ও সমমানতা বা হোমোজিনিয়টির দ্বন্দ্ব, ইণ্ডাষ্ট্রির সমাজে এস্টাব্লিশমেন্ট অনুসারতা, ব্যক্তিত্ববাদের অবসানে অবশেষে সর্বগ্রাসী কর্পোরেট সেক্টরমনস্কতা এবং সমাজে মানবিকতাবিহীন পুঁজির সার্বভৌমত্ব কবিদের মধ্যে ঘনিয়ে তুলছিল এক ছটফটানি!

কোনো চিত্রকল্প মনের এমন আবেগকে যেন এই পরিবেশে জাগিয়ে

তুলতে পারে যা চেতনারহিত গড্ডলপ্রবাহেও মানবিক উত্তরাধিকারের ইঙ্গিত দেয়—এমনি তখন আকাঙ্ক্ষা তরুণদের। জর্জীয় কবিশেখর এ. ই. হাউসম্যান তাঁর 'দি এইম অ্যাণ্ড নেচার অব পোয়েট্রি'-তে বললেন উপমা-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি 'থিংস ইনএসেনসিয়েল টু পোয়েট্রি।' এ-সব লক্ষ্যতে নয়ই বরং এরা একবারেই আনুষঙ্গিক একস্ক্রেসরিজ। অবশ্য হাউসম্যানের এমন চিন্তা ছিল যে চিত্রকল্পের আছে 'খুশি করার স্বাধীন ক্ষমতা'ও। হিউমের কাছে স্বাধীন ক্ষমতাই হলো মূল লক্ষ্য।

চীনা বা জাপানি কবিতায় একটি বিশেষ চিত্রকল্পই যেমন কবিতা-টিকে ধরে রাখে, এমন-কি ক্লাসিক কাঠিন্যে ঐ চিত্রকল্পটিকে যোগ্যভাবে প্রকাশ করলেও এমন আবেগের উন্মোচন ঘটে, যার ফলে অতি রোমান্টিক জর্জীয় ফাঁপা কবিতাচর্চার বাইরে অন্যতর বিভাসে কবিতাকে অভিষিক্ত ক'রে জীবনকে ও বিশ্বকে বোঝবার মতো যেন তা বাতাবরণ তৈরি করে দিতে পারে। মেটাফিজিক্যাল কবিতার পণ্ডিতদের কাছেও অনেক কিছু শেখবার আছে বলেছিলেন চিত্রকল্প আন্দোলনের প্রথম যুগের অন্যতম সঙ্গী টি. এস. এলিঅট।

মেটাফিজিক্যাল কবিরা সতের শতাব্দীর ইংলণ্ডে-যে বস্তুর অন্তঃসার ইত্যাদি তথাকথিত মেটাফিজিক্যাল তত্ত্বে আকৃষ্ট ছিলেন এমন নয়। কাউলি ও ডানকে ডক্টর জনসন বিশেষভাবে বেছে নিয়ে তাঁদের বুদ্ধিবাদী রচনার জন্য অভিধা দিয়েছিলেন মেটাফিজিক্যাল। তাঁরা দৈনন্দিন জীবন থেকে বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নতুন মানসভুবন থেকে সংগ্রহ করতেন চিত্রকল্প। হাউসম্যান যেমন চিত্রকল্পকে বলেছেন কবিতার অঙ্গে গয়নামাত্র বলে তেমন নয়, বরং মেটাফিজিক্যালরা তাঁদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নান্দনিক অনুভূতিগুলিকে দারুণভাবে এবং সঠিকভাবে প্রকাশ করতে ব্যবহার করতেন চিত্রকল্প। প্যারাডক্স ব্যবহার করতেন তাঁরা একই প্রয়োজনে। কবির মনের বিকাশ তাঁদের

কবিতার এমনভাবে গ্রথিত থাকত যাতে কবিতার তথাকথিত যুক্তিশৃঙ্খল পাওয়া ভার হতো।

চিত্রকল্পের মধ্যে ও আছে পুরো বলার কথাটি। উদাহরণ, প্রিয়তমার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক অন্বেষণ করতে যেমন মার্ভেল-এর জ্যামিতির সমান্তরালতার ব্যবহার দেখছি, তেমনি ডানের বিদায়ী প্রেমিকযুগলের বিদায় ব্যাখ্যার চিত্রে জ্যামিতির কম্পাসের চিত্রকল্পটির যোগ্য ব্যবহার পাচ্ছি ঃ

If they be two/they are two so/
As stiffe twin compasses are two,/
Thy soule the fixt foot, makes no show/
To move, but doth, if th'other doe./

মেটাফিজিক্যালরা চিত্রকল্পে উপমা, উৎপেক্ষা, রূপকের ব্যবহারে গণিত, বিজ্ঞান এবং তার পাশাপাশি চলতি জীবনের ছবি বসিয়ে নিতেন। সেখানে রয়েছে হয়তো উপমান-উপমিতে চারিত্র্য-দূরত্ব আসমান-জমিন, কোনো আপাত মিলও নেই তাদের মধ্যে, অথচ কোথায় রয়েছে এক অনুদঘাটিত যোগাযোগ। অর্থাৎ মেটাফিজিক্যাল কবিদের সেই যে উপমার মধ্যে, প্যারাডক্সের মধ্যে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব, অথচ বিরোধী বিষয়বস্তুর মধ্যেও সাধারণ মিল পেয়ে যাওয়া—তাছাড়া সেগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল যে ক্লাসিক সারল্য, অনিবার্যতা ও বাস্তবতা—এসব কিছুই ফাঁপা রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে ঘনিয়ে তুলল আঙ্গিক ও প্রকরণের বিদ্রোহ। ইথারাইজ্‌ড আপ অন এ টেবল-এর সন্ধ্যাকে পাওয়াই আমাদের দায় হতো যদি হিউম প্রবর্তিত চিত্রকল্পের আন্দোলন না দেখা দিত। এসব বিদ্রোহের ফলাফল আমাদের একটা কাছে স্বতঃই পেয়ে যাওয়া-যে 'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা' বুঝতে একদণ্ডও অসুবিধা হয়না।

ব্রিটেনে তখন নতুন কবিতা আন্দোলনের বেশ বোলবোলাও। ১৯০৯ সালে ফোর্ড ম্যাডক্স হুবার (অর্থাৎ ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড)

'ইংলিশ রিভিয়ু' বের করলেন। তিনি পাউণ্ড, ফ্লিন্ট এবং লরেন্সের রচনা পত্রস্থ করেছিলেন বছরখানেক পরে। পত্রিকাটির হাত বদলের ফলে নতুন কবিতা-আন্দোলন বেশ ধাক্কা খায়। রক্ষণশীল পত্রিকাগুলির সঙ্গে লড়বার জন্য শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ সালে ছোট্ট একটি পত্রিকা ইমেজিস্টরা হাতে পেলেন। ইতিমধ্যে 'পোয়েট্রি রিভিয়ু' এবং ঐ পত্রিকার উত্তরাধিকারী 'পোয়েট্রি অ্যাণ্ড ড্রামা'—হ্যারল্ড মনরোর 'পোএট্রি বুকশপ'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত পত্রিকায়—তাঁরা কিছুটা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

তারপর সেই মজার ঘটনাটি ঘটল। ১৯১৩ সালের জুন মাসে 'দি নিউ ফ্রি উওম্যান: এ্যান ইনডিভিডুয়ালিস্ট রিভিয়ু' পাক্ষিকপত্রটি প্রকাশিত হলো। শ্রীমতী হ্যারিয়েট উইভার এবং শ্রীমতী ডোরা মার্শডেন মহিলা আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। এই দুজন বয়স্কা কুমারীর একজনের ছিল দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের প্রতি আর অপর জনের ছিল বার্কলীর মেটাফিজিক্সের দিকে ঝোঁক। শ্রীমতী উইভারের কিছু পয়সাকড়িও ছিল। পত্রিকাটি ইমেজিস্টদের চোখে পড়ল। পাউণ্ড ঐ দুজন দর্শন-পাগল মহিলাকে বোঝালেন, বোধ হয় ভজালেন, যে একেবারে আধুনিক মন নিয়ে পত্রিকা বের করা উচিত। ফলে ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে গেল রিচার্ড অ্যালডিঙ্‌টনের সহকারী সম্পাদনায়। শ্রীমতী মার্শডেন নামে সম্পাদিকা রইলেন, কৌতূহলী পাঠকেরা তাঁর লেখা সম্পাদকীয় বাদ দিয়েই পত্রিকাটি পড়তেন। পরে 'ইগোইস্ট' প্রকাশিত হলে অবশ্য 'অ্যান ইনডিভিডুয়ালিস্ট রিভিয়ু' উপশিরোনামও যুক্ত থাকল।

প্রথম সংখ্যা 'ইগোইস্ট' প্রকাশিত হলো ১৯১৪ সালের পয়লা জানুয়ারি। ১৯১৫ সালে তা মাসিক পত্রিকা হলো। ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে পত্রিকাটি উঠে গেল। ইতিমধ্যে সহকারী সম্পাদনায় রিচার্ড অ্যালডিঙটনের সঙ্গে এইচ. ডি র নাম যুক্ত হলো, ১৯১৭ সালে তাঁদের

দুজনের নামের বদলে সহকারী সম্পাদক হিসাবে দেখা গেল নতুন নাম—টি. এস. এলিঅট।

'ইগোইস্ট' পত্রিকাটি প্রকাশের পর দামাল পাউণ্ড একটি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হলেন। অ্যালডিঙটনের দশটি কবিতা, এইচ. ডি.-র সাতটি কবিতা, নিজের ছটি কবিতা এবং আরও অন্যান্যদের কিছু 'ইমেজিস্ট' কবিতা দিয়ে প্রকাশ করলেন 'Des Imagists : An Anthology'. ব্রিটেনে বইটাকে সবাই প্রায় বাঁকা চোখে দেখলেন, শুধু 'মর্নিং পোস্ট'-এ একটা ভালো সমালোচনা ছাপা হলো। অপমানিত ক্রেতারা হ্যারল্ড মনরোর পোএট্রি বুকশপে বইগুলি ফেরত দিয়ে গেল।

যাই হোক, বইখানি প্রকাশের পর পাউণ্ডের ইমেজিস্‌মের প্রতি উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। তিনি নতুন আন্দোলন Vorticism নিয়ে মেতে উঠলেন। তাঁর নতুন ইস্তাহার 'Blast'-এ লিখলেন ফোর্ড ম্যাডক্স হুবার, রেবেকা ওয়েস্ট, এজরা পাউণ্ড, জ্যাকব এপস্টাইন, যদিয়ে-ব্রেজকা এবং টি. এস. এলিঅট। দল ভাঙাভাঙি সম্পূর্ণ হলো। ইমেজিস্ট আন্দোলনের প্রতি পাউণ্ডের মোহ কাটলেও এ সময়ে এ আন্দোলনের রক্ষাকর্ত্রী হলেন শিক্ষিতা ও অভিজাত মহিলা অ্যামি লাওয়েল, যিনি "Smoked cigars and worshipped Keats"। বার্কলী হোটেলের আকর্ষণ কেনসিঙটনের তরুণ কবিদের কাছে স্বর্গ বলে মনে হলো। এলাহি ভোজ্যের বদলে যেন অ্যামি লাওয়েলকে দলনেত্রী বলে মেনে নেওয়া হয়। বছরে বছরে ইমেজিস্টদের সঙ্কলন বেরোবে বলে জানানও দেওয়া হলো। এবং ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯১৭-তে সঙ্কলন প্রকাশিতও হলো।

পাউণ্ডকে আর সঙ্কলনগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। পাউণ্ড ব্যঙ্গ করে এই আন্দোলনের নাম দিলেন অ্যামিইজম। অবশ্য পাউণ্ডের মতে "আমার বিকাশ রেখার একটি বিশেষ বিন্দু ছিল ইমেজিস্‌ম। কেউ কেউ

সেই বিন্দুতেই আটকা পড়লেন। আমি এগিয়ে গেলাম।" যে ছজনকে ইমেজিস্ট বলে জোর ঢাক পেটানো হলো, তাঁদের তিনজন ব্রিটিশ (অ্যালডিংটন, ফ্লিন্ট এবং লরেন্স) বাকি তিনজন মার্কিন (এইচ. ডি., ফ্লেচার এবং লাওয়েল)। ইমেজিস্‌মের নীতি বলে মানা হলো:

১। চলতি কথা থেকে শব্দচয়ন, অনিবার্য বা প্রায় অনিবার্য শব্দ ব্যবহার, অলঙ্কারময় শব্দ বর্জন। ২। কবিতা রচনায় ছন্দগত স্বাধীনতা প্রয়োজন। পুরাতন ছন্দ পুরাতন মেজাজেরই প্রতিধ্বনি করে। নতুন শব্দের ধ্বনির সামান্য নতুন চিন্তার বাহন। সেজন্যই ভার্স লিবর ব্যবহার প্রয়োজন। কবির বিষয় নির্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। সেজন্য আধুনিক জীবনের এরোপ্লেন, মোটরগাড়ি নিয়ে বাজে কবিতা লেখার চেয়ে অতীতের বিষয়বস্তু নিয়ে ভালো কবিতা লেখা ঢের বেশি মূল্যবান। ৩। চিত্রকল্পের বিষয়ে একেবারে নিবিড় রূপদান প্রয়োজন। Cosmic ধোঁয়াটে কবি হওয়ার মানে কবিতার সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে ফানুস রচনা। ৪। কবিতা হবে দৃঢ় সংবদ্ধ, স্পষ্ট এবং অবধারিত। ৫। ঘনত্বই কবিতার নিশ্চিত সারাৎসার।

১৯১৭ সালে এই সিরিজের শেষ সঙ্কলন প্রকাশিত হলো, কিন্তু ১৯৩০ সালে আবার নতুন একটি সঙ্কলনও প্রকাশ করা হয়। 'Imagist Anthology: 1930'-এ কবিতা লিখলেন এবার অ্যালডিংটন, কোর্নোস, এইচ. ডি., ফ্লেচার, ফ্লিন্ট, ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড, জয়েস, লরেন্স এবং উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মস। ভূমিকা লিখলেন ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড এবং গ্লেন হিউগস।

ইমেজিস্ট আন্দোলনের ভস্মাবশেষ নিয়ে টেমসের জল বহু বছর ধরে সমুদ্রে মিশেছে। তবু আধুনিক নতুন কবিতার প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে তাঁদের নেতৃত্ব, বহু ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যবস্থাপত্রের সতর্কবিচার অদ্যাবধিও নতুন কবিদের শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে আছে। আধুনিক কবিতা বিকাশের ইতিহাসে ইমেজিস্টদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েই গেছে।

'বিশুদ্ধ' কবিতার আমি বিপক্ষে নই, কিন্তু আমি অ-বিশুদ্ধ কবিতার পক্ষে প্রবলভাবে। আসলে কোনো কবিতা আন্দোলনইতো নিরঙ্কুশ নয়। সময়ের বদল, বিশেষভাবে যুগের মেজাজ বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় কবিরও মেজাজ। এখন তাই কেউ যদি বলেন তিনি মালার্মে, স্তেফান জর্জ, রিলকে বা আলেকজান্দার ব্লক, এমন-কি ভালেরিকে নিয়ে ভাবছেন কেবল, তাহলে বুঝতে হবে তিনি কবিতা আন্দোলনের একটি বিশেষ মেজাজকে ধরে বসে আছেন। পরিবর্তনের ব্যাপার ভাবতে পারছেন না।

কিন্তু বিশুদ্ধ কবিতা কী! বিশুদ্ধ কবিতার প্রবক্তারাও কি ঠিকঠাক জানতেন? প্রতীকবাদী মালার্মে বলবেন, কবিতা ভাব দিয়ে লেখা হয়না, লেখা হয় শব্দ দিয়ে। আর শব্দের মূল আকর্ষণ সঙ্গীত। কবিতার আসল যে-রূপ, সেই হারানো সঙ্গীতেরই আবার পুনর্বাসন হবে বিশুদ্ধ কবিতায়। অর্থাৎ বিমূর্ত সঙ্গীতে। এ-কবিতায় অনন্য লক্ষ্য সৌন্দর্য। এবং সৌন্দর্যের লক্ষণ বিষাদ আর রহস্যময়তা।.

ভাগনারের সুরের দেদীপ্যমানতায় সে লক্ষণ যেন উৎসারিত। রঁদার ভাস্কর্যে তা যেন সুনিপুন সংগঠন। আর নিরবয়ব সেই সৌন্দর্য প্রতিমা, যা ব্লকের কাছে 'আশ্চর্য কুমারী', রিলকের নিকটে অর্ফিয়ুস নাকি ইউরিডাইস যার 'যৌনতা সন্ধ্যাসমাগমে তরুণীপুষ্পের মতো মুদিত হয়েআছে'।

বোদলেয়র ক্যাথলিক প্রতীকগুলি ঘুরিয়ে ধরেছিলেন তাঁর প্রণয়িণীর দিকে, তাঁর নিজের দিকেও। দৃশ্যমান জগৎ থেকেই প্রতীকগুলি উঠে আসে, তবে কবির চোখ থাকে অন্য দিকে। কবিতা যেন চোখের দৃষ্টির প্রতি মনস্ক কিন্তু কবির সাধ তাঁর গোপন অন্তরতম বাসনার প্রতি, তাঁর গোপন উত্তেজনা, তাঁর নিঃশব্দের চমক আর সত্তার নীরব ধ্যানমগ্নতার প্রতি।

অল্প কথায় বলতে গেলে, শুদ্ধ কবিতার একমাত্র ঝোঁক শুদ্ধতার দিকে। শব্দ সে কবিতার উপকরণ মাত্র। কিন্তু উপকরণ হলেও তার সামাজিক অনুষঙ্গ থেকে সে শব্দকে ছিঁড়ে আনতে হবে। দিতে হবে তাকে ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ। আর কবির মনের মধ্যে রয়েছে যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, শব্দ তারই কোনো না কোনো বিষয়ের প্রতীক হয়ে আসবে। ব্যক্তিগত, নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ নিয়ে এ-কবিতা। শুদ্ধ কবিতা।

এতদিন ধরে কোনো শব্দ বা অভিজ্ঞতা বাইরে থেকে এসে যেন ভেতরটা নাড়িয়ে দিত, আবেগের উন্মোচন ঘটাত আর সেই আবেগ থেকে মুক্ত হবার বাহনই ছিল কবিতা। শুদ্ধ কবিতার কবির কাছে, যেন অন্তর-প্রোথিত কোনো অনুষঙ্গ ঐ শব্দকে আশ্রয় করেছে, আবেগের উন্মোচন নয়, বরং উন্মোচনই মন্ময় আবেগের জন্ম দেয়। তা অন্তরাভিসারি কবিতা গড়ে তোলে। যেন মনের রহস্যের সমুদ্রে নিরুদ্দেশ যাত্রার সুন্দরী। মনের মধ্যেই 'দূর পশ্চিমে ডুবিছে তপন'। মনকে নিয়েই সব কিছু। মনেই কবিতার মুক্তি ও জন্ম এবং পাঠ।

তা হলে এ কবিতা কোনো শিক্ষা দেবার ভান করেনা, পাঠকের বিশ্বজ্ঞান বাড়াবার প্রচেষ্টা করেনা, এমন কি পাঠককে কোনো মতের অনুষঙ্গী করার চেষ্টাও চালায় না। এ কবিতা তার চিত্রকল্প বা বুদ্ধিগত প্রতীকে যেন শেকসপীয়রের কোনো গীতিকার মতো নৈর্ব্যক্তিক, মালার্মের যন্ত্রণাবোধে স্পন্দিত, এমন কি ব্লেকের কবিতার ঔজ্জ্বল্যের কোনো অদৃষ্টপূর্ব দর্শনের মতো ইনসপায়ার্ড। তাঁর ফোর কোয়ার্টেট-এর বর্ণট নর্টন-এ Time and bell have buried the day-তে এলিয়ট যে অনামা কবির কবিতার অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন, সেই The maidens came when I was in my mothers bower কবিতাকে কেউ বলেছেন শুদ্ধ কবিতার যেন আকর উদাহরণ। শুদ্ধ কবিতা ছাড়া সব কবিতাই যেন জ্ঞান দেবার

জন্য তৈরি, এক পায়ে খাড়া রয়েছে বর্ণনামূলক হবার জন্যে। অনেকে বলছেন, কবিতা আদতে বিশুদ্ধতায় স্বচ্ছ, বোধিবিবর্জিত, কেবল তা শুদ্ধ আঙ্গিক !

শুদ্ধ কবিতার কবি কবিতাকে যৌথ-মন্ময়তা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান। কবিতা হয়ে ওঠে কেবলমাত্র যেন ব্যক্তিগত মুক্তির বাহন। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত। এক সৌন্দর্য-চৈতন্যস্বরূপ যেন কবিতা। কবিতা কিছু বলেনা। কবিতা কেবল কবিতাই।

কিন্তু কবিতার ধর্ম কি কেবল সেটুকু হয়ে যাওয়াটাই ? কোনো লেখক বলছেন কবিতা আবার কবিতাকেও অনেক সময় ছাড়িয়ে যায়। ওয়ালেস স্টীভেনসের শেষ দিকের কবিতাকে নিয়ে যেমন বলেছেন পিয়র্স। কেউ কেউ এ-দেশেও যেমন বলেছেন রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের লেখা কবিতাগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে।

শুদ্ধতার অনুসারীদেরও তো নানা নাম। তবে প্রতীকবাদীরাই মুখ্যত নিজেদের শুদ্ধতর কবিতার লেখক বলে মনে করেছেন। তাঁদের কাছে কবিতা অন্ধ উদ্দীপনের জাতক অথবা ব্যাখ্যার অসাধ্য হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো নির্জ্ঞানের বিস্ফোরণ নয়। কবিতা হলো শৈলী আর দর্শনচিন্তার এক অনন্য ঐক্য। মালার্মে নিজেই বলেছেন, "...পারনাশাঁ-রা বস্তুকে নিতেন সম্পূর্ণভাবে এবং দেখাতেনও তাই, এই হলো তাঁদের ভূমিকা। তাঁরা মনকে ফাঁকি দিতেন মনের এক মধুর আনন্দবোধ থেকে, তার বিশ্বাস থেকে যে তা সৃষ্টি করছে। কোনো বস্তুর নাম করা মাত্রই কবিতাটির উপভোগের তিন-চতুর্থাংশই বরবাদ হয়ে যায়। কবিতাটি উপভোগ তো কবিতাটির তৃপ্তি থেকে আসছে যা ধরতে পারার মতো একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে পাওয়া ; ইঙ্গিত দেওয়া, সেটাইতো ধূপছায়া। রহস্যময়তাকে ঠিকমতো ব্যবহারই গড়ে তোলে প্রতীক : মনের অবস্থাকে বোঝানোর জন্য কোনো বস্তুকে একটু একটু করে জাগিয়ে তোলা অথবা উল্টোভাবে

কোনো বস্তুকে বাছাই করে নেওয়া আর তা থেকে মনকে উন্মোচন করে ছাড়িয়ে নেওয়া, ধাঁধামুক্ত হওয়া ধাপে ধাপে।"

যা কিছু দৈববশে এসে পড়েছে, যা কিছু অপ্রয়োজনীয়; অথচ মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে-সব, মালার্মে তাদের বাদ দেবেন। প্রতিটি শব্দ যেন যে-কোনো কঠিন বস্তুর মতো ত্রিমাত্রিক, অথচ সঙ্কোচন-প্রসারণ গুণে প্ল্যাস্টিক। শব্দ আর কোনো ভাবের চিহ্নময় বাহন নয়, বরং হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায় কঠিন আর বিশাল। ১৮৮৬ সালে তিনি বলেছিলেন, "কবিতা হলো মানুষের ভাষা দিয়ে প্রকাশিত—যে ভাষায় অস্তিত্বের নানাদিকের রহস্যময় ধারণার সারাংসার ছন্দে পুনঃসংস্থাপিত হয়েছে, কবিতা আমাদের দেয় পূর্ণ অধিকারময় ভ্রমণ আর একমাত্র আত্মিক কর্তব্য।" অর্থাৎ ভালেরি যেমন তাঁর বোদলেয়র বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছিলেন এডগার অ্যালেন পোর কথা বলতে গিয়ে 'pure state', তেমনি। পো অত্যন্ত কঠিন অথচ চমৎকার করে তত্ত্বে কিছুটা গণিতের সঙ্গে একধরণের মরমিয়াবাদকে সংযুক্ত করেছিলেন। সিম্বলিস্টদের ধারণা ছিল ইঙ্গিতময়তা আসে আদিম ভাষা থেকে যে ভাষা অর্ধেক গেছে হারিয়ে, বাকি অর্ধেক আছে জীবিত, সেই আদি ভাষা আধা অস্তিত্বে আর আধা অনস্তিত্বে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। এ ভাষার আছে স্বপ্ন আর সঙ্গীতের সঙ্গে অনতিসাধারণ সম্পর্ক।

অবশ্য এই আদি রহস্যের কথা ভাবতে গিয়েও এঁরা কিন্তু সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, তখনো পর্যন্ত জীবিত, আফ্রিকা বা পলিনেশিয়ার যাদুকর্মের সঙ্গে প্রতীক-সম্পর্ক গড়ে তুললেন না, বরং সংযোগ সাধন করলেন তাঁদের নিজের দেশের মৃত মধ্যযুগের যাদুবিদ্যা বা কৃত্যের সঙ্গে। যাদুবিদ্যা প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম বৈপরীত্য বা অনন্বয় উত্তীর্ণ করার অন্যতম মানস ও কৃত্য অভিক্ষেপ ছিল মানুষের সমাজ-বিকাশের আদিযুগে। কিন্তু বিকৃত ও কালোচিত্যদোষে তা জীর্ণ ছিল শ্রেণীবিভক্ত

মধ্যযুগের সমাজে। অর্থাৎ সে যাদুবিদ্যা আর স্বাভাবিক ছিল না। বরং এই বিকৃতি যুক্ত হয়ে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপেতো স্বাভাবিক ছিল পশ্চাদমুখিনতা, সংস্কারকুশ্রীতা ও অন্ধ অনুকৃতি।

আর যে শব্দনিয়ে তাঁরা খেলনা বানাচ্ছিলেন তার আদিরূপ কি আর অপরিবর্তিত ছিল? বরং স্বাভাবিক ছিল নতুন অনুষঙ্গের তাৎপর্যে পুরনো শব্দের প্রাথমিক অর্থের পরিবর্তন। শব্দতো ফাঁপা। অভিজ্ঞতাই শব্দর মানে বদলে দেয়। কেউ কি এখন 'দুহিতা' বলতে গোরু দোয়ানো মেয়েটিকে বোঝায়? শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটে গেছে।

সিম্বলিস্টরা ভেবেছিলেন, শব্দের আদিতে আছে উচ্চারণের মধ্য দিয়ে রচিত বস্তুরহস্যের যে শব্দচিত্র, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সঙ্গীত। রহস্যউন্মোচন করতে শব্দ অনেকখানি ভূমিকা পালন করে, তবু শব্দের আয়ত্তে নেই রহস্যউন্মোচনের পুরো ভূমিকা। তাই শব্দগুলিকে যোগ্যভাবে গেঁথে গেঁথে, এমন কি পুনরাবর্ত্তনের স্পন্দনে উচ্চারণ করে, রহস্যের উদ্‌ঘাটনে পৌঁছতে হয়। তবু তো রহস্যের উন্মোচন ঘটেনা। জানা হয় না অনেকখানি। তাই এক বিষাদ থাকে জড়িয়ে। তার সঙ্গে রহস্যময়তা থাকে ছড়িয়ে। আর কবিতার সৌন্দর্যও তাই রহস্য ও বিষাদের নিবিড় ঐক্য।

এত সব কথাবার্তার পরেও আমাদের মনে কেমন এক অতৃপ্তি রয়ে যায়। শব্দকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গির অথবা শব্দের মধ্য দিয়ে ভুবনখানি দেখবার প্রচেষ্টার মধ্যে রইল এক দার্শনিকতা। কিন্তু অনুপস্থিত রইল আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দিক। শব্দের শিকড় খুঁজতে গিয়ে এসে গেল ঐতিহ্যমনস্কতা, কিন্তু এলোনা সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বিশুদ্ধ কবিদের কিন্তু পছন্দ করি ভিন্ন কারণে। আমার বিশ্বাস, এঁদের কবিতার উৎসে ছিল বিদ্রোহ। এবং সে বিদ্রোহ ফরাসী পুঁজির বিরুদ্ধে। সিম্বলিজম-এর নামে 'শুদ্ধতা'র মধ্যেও ছিল তখনকার যুগের প্রতিবাদ। সার্ত্রে অবশ্য এঁদের ঠিক বিদ্রোহী বলে

মানতে পারছেন না। তাঁর মতে, এমন কি শার্ল বোদলেয়রও বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে-যে বিদ্রোহ করেছিলেন, সে বিদ্রোহে তিনি ঐ সমাজের মূল্যবোধগুলিকে মেনে নিয়েই স্যাটানিজমের নামে খৃস্টতন্ত্রকে উল্টে ধরেছিলেন। কোনো নতুন বৈপ্লবিক মূল্যবোধ তিনি গড়ে তোলেন নি। তাঁর চতুর্দিকে তিনি তাসের ঘরের মতো বানিয়ে ছিলেন ঝুটা বিপ্লবের অবয়ব।

১৮৪৮ সালে ফরাসীদেশে বিপ্লব হয়েছিল। লুই ফিলিপ্পির শাসনের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্র গঠনের জন্য বিদ্রোহ, বিপ্লব। আশা ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রেও সৃষ্টি হবে নবজীবনের ভিত্তি। সে বিপ্লবে শ্রমিকেরা পারীর রাস্তায় বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বী হয়ে অস্ত্রধর হলেন। কিন্তু বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করেই, শ্রমিকদের চাইল নিরস্ত্র করতে। বুর্জোয়া সেনাবাহিনীর আক্রমণে শ্রমিকের রক্তে রাজপথ কর্দমাক্ত হলো। আর সেই রক্তমাখা পথে পা দিয়ে বুর্জোয়ারা বসলো আইনসভায়। লুই নেপোলিয়ন শেষে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন নিজেকে। তঞ্চক নেতা লুই নেপোলিয়ন কেবল ফরাসীদেশেই বিকৃতির বাহন হলেন না, বকলমে আক্রমণ করলেন মেক্সিকোর প্রজাতন্ত্রকে ; উৎকোচ-অন্যায় এবং বিকৃত শোষণের পথ বেয়ে ডেকে আনলেন ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধ। পুঁজিবাদী নেতৃত্ব কেমনভাবে শ্রমজীবী মানুষের পারী কমিউন রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিল, তাও তরুণ কবিরা দেখলেন। যেমন, ১৮৭১ সালে সতের বছরের তরুণ আর্তুর র‍্যাঁবো ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুগে নিহত যুবক সৈন্যটির ডান বুকে দুটি ক্ষতচিহ্ন লক্ষ্য করে বুর্জোয়া জাত্যন্ধ বিকৃতিকে ঘৃণার কশাঘাতে বিদীর্ণ করে চমৎকার ভাবে প্রকাশ করলেন। অর্থাৎ রুচিহীন, লোভী, মানবিকতা থেকে সুদূর, এই মানবপশুতন্ত্রকে ঘৃণা করতে গিয়েই এঁরা শুদ্ধ শিল্পের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় বৃটেনের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও সে দেশের বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা। যেমন কার্লাইলের 'পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট'

(১৮৪৩)। ফ্রান্স-জার্মান পত্রিকায় কার্লাইলের 'পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট' বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকারকে এঙ্গেলস বলেছিলেন 'বৃটেনের একমাত্র ভদ্রলোক'। পুঁজিবাদের লোভ, মানবতাঘাতী দৃষ্টিভঙ্গি কার্লাইলকে পীড়িত করেছিল। বুর্জোয়া অর্থনীতি চিন্তাকে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন ম্যামনের শাস্ত্র বলে। এঙ্গেলস কার্লাইলকে ইংলণ্ডের তৎকালীন একমাত্র 'সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ' আখ্যা দিয়েও বলেন কার্লাইল সমস্ত ব্যাধির কারণ বলে মনে করেছেন অবাধ প্রতিযোগিতা। আসল ব্যাধি রয়ে গেছে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যে।

ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব যখন প্রতিবিপ্লবে রূপ নিল, বুর্জোয়া সমাজসম্মত অনন্বয়কে উত্তীর্ণ হতে গিয়ে কবিরা কবিতা-রচনার আদিকালে ফিরে যেতে চাইলেন। আদিকালে প্রকৃতি ও মানুষের অনন্বয় উত্তীর্ণ হবার সমাধান হিসাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার আপাত-অক্ষমতার মধ্যদিয়ে রূপ নিয়েছিল যাদুবিদ্যা। সেই আদি মানবসমাজে শব্দগুলি অভিজ্ঞতার বাহন হিসাবে উঠে আসত উচ্চারণে। তার ধ্বনির মধ্যে ছিল প্রকৃতির নিরঙ্কুশ অধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার স্বর—শব্দে ছিল প্রয়োজনের জগৎ এবং অবোধ্য কার্যকারণের ভুবন থেকে স্বাধীনতার উত্তীর্ণ হবার জন্য মানবিক শ্রমের উপলব্ধি।

ইতিমধ্যে যে ইউরোপীয় সমাজ আরও কয়েকটি অনন্বয় গড়ে তুলেছে ফ্রান্সের কবি-বিদ্রোহীদের তা ধারণায় আসেনি। অর্থাৎ শ্রেণীতে শ্রেণীতে অনন্বয়, একই শ্রেণী ও তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যে অনন্বয় এবং ব্যক্তি ও আপন সত্তার মধ্যে অনন্বয়। শ্রেণী-বিভাজনের দাস-প্রথার অনন্বয় থেকে একদা জন্মেছিল গ্রীক নাটক। তার মহামহিম ট্রাজেডি। এসেছে ইউরোপীয় ট্রাইবাল সমাজের গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে অনন্বয় থেকে মহাকাব্য। শ্রেণী ও তার অন্তর্ভুত ব্যক্তির অনন্বয় থেকে এবং একই শ্রেণীর প্রগতি-মুখিনতা ও মুক্তি-বিমুখিনতার দ্বন্দ্ব থেকে দিভাইন কমেদির মতো পেয়েছি মহাকবিতা। পরে এসেছে পুঁজিবাদের যুগে ব্যক্তির বিকাশের তাৎপর্যে

নতুন নাটক, লিরিক ও তারপর উপন্যাস। অর্থাৎ বিভিন্ন ইতিহাসস্তরে এসেছে বিভিন্ন শিল্প-আঙ্গিক।

প্রকৃতি ও মানুষের অনন্বয়কে নিয়ে যাঁরা রচনা করতে চাইছিলেন আদি কবিতার রূপ, আদিম শব্দচিন্তার মঞ্জুষা থেকে যাঁরা তুলে আনতে চাইছিলেন শব্দের আর্কিটাইপ অনুভব, সে জগতের কিন্তু আর অস্তিত্ব ছিলনা। সুতরাং কবিতা যদি চতুর্বিধ অনন্বয়কে উত্তীর্ণ করে স্বাধীনতার স্বরূপ না দিতে পারে, সে রচনা আর কবির ভূমিকার যোগ্য হয়ে ওঠে না। কবির কাছে বরং তখন এসে গিয়েছে সব অনন্বয়ের নির্যাস হিসাবে পুঁজিবাদী বিকাশের তাৎপর্যে সম্পর্কবিকার। কেননা এ যুগেই শ্রমিকের উৎপাদন শ্রমিকের সম্মুখীন হয় শত্রুর মতো। "তার পৌরুষ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সে হ'য়ে ওঠে একেবারে বস্তু। ···অনন্বয় তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিধৃত পুঁজিবাদী উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত।"

রিলকে সুন্দরী রমণীকে গোলাপ ফুল দিতে গিয়ে গোলাপের কাঁটায় রক্তবিষাক্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন, আলেকজান্দার ব্লক শেষ পর্যন্ত দ্য টুয়েলভ্ রচনার পরেও হৃদয়দীর্ণ হয়ে শেষশয্যা নিলেন, অথবা আপলনিয় মৃত্যুর সময় সাধারণ মানুষ যখন কাইজার উইলহেলমের মুণ্ডপাত করছিল তখন তাতে নিজের গুইলোম নামটি শুনতে শুনতে বিগতপ্রাণ হলেন—সব কিছু মিলে এই 'শুদ্ধ' পন্থীরা আবেশ-পাওয়া, প্রায় উন্মাদ একদল মানুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁরা শব্দের শিকড়ে যেতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন প্রতীকের প্রয়োগে মনের মধ্যে যে আদি-কালের বাসিন্দাটি রয়ে গেছে, তার উন্মোচন। চেয়েছিলেন মনের মধ্য থেকে প্রতীক প্রায় বঁড়শি বিঁধিয়ে তুলে আনবে বিস্মৃত এক মহাদেশকে। আর সেই মহাদেশের আলো-অন্ধকারে আছে অস্তিত্ব থেকে অন্তঃসারে যাবার উপায়। তারিয়ে তারিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হবে।

সিম্বলিস্টরা মনে করতেন, "ইন্দ্রিয়গত সংবেদনের ঊর্ধে আছে আসল সত্য। আর এই বিশ্বাসের তাগিদে তাঁদের তীব্রতার দাক্ষিণ্যে

ও যুক্তিহীনতায় এবং অপরাপর বিশ্বাসের প্রতি অমনস্কতার তাৎপর্যে তাঁরা ছিলেন অনেকখানি মিস্টিক্যাল।" প্রতি শব্দই ছিল তাঁদের কাছে আপাতদৃষ্ট প্রপঞ্চ বা ফেনোমেনার ঊর্ধ্বে পরমকে ধরবার এক অভিজ্ঞান। মালার্মের কাছে পরমও আবার পরম সৌন্দর্য। তাঁর কাছে, ফুল 'শব্দটি বিশেষ ফুলের অভিধা নয়, শুদ্ধ দর্শনের তা অঙ্গীকৃত। ইন্দ্রিয় সংবেদনের তা আয়ত্তে নয়।' বাওরা বলছেন, "তাঁরা দৃশ্যমান বস্তুপুঞ্জের ভাষা দিয়ে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে বোঝাতে প্রয়াসী ছিলেন। আর এজন্যে প্রতিটি শব্দই ছিল প্রতীক। যে শব্দ সাধারণ ব্যবহারের বাহন নয়, সে শব্দ এমন অনুষঙ্গ জন্ম দেয় যা সংবেদনের ঊর্ধ্বে পরম বাস্তবতাকে উৎসারিত করে"।

মালার্মে বলেছিলেন "কবিতা কোনো সংবাদ বহন করেনা, বরং ইঙ্গিত দেয়, জাগিয়ে তোলে; বস্তুপুঞ্জের অভিধা নয় গড়ে তোলে তাদের বাতাবরণ।" তাঁর গুরু পো চেয়েছিলেন, "ভাসাভাসা বিষয়ের ইঙ্গিতময় অনির্দিষ্টতা এবং তার ফলে থাকবে মন্ময় প্রভাব"।

দীর্ঘদিন এ কবিদের কিন্তু আর নিছক শুদ্ধতায় বসে থাকা সম্ভব হয়নি। ব্লককে দ্রুত পায়ে বিপ্লবের দিকে এগোতে হয়েছে। বারোটি বলশেভিকের জাঠার সামনে তিনি দেখেছিলেন যীশুখৃষ্টকে।

সার্বভৌম/পদপাতে/তারা চলে /
পেছনে পেছনে ক্ষুধার্ত খেঁকী কুকুর,
সামনে তাদের রক্ত/পতাকা দোলে—
ঝড়ের মধ্যে দেখা যায় না তো মোটে
রাইফেল/থেকে মুক্ত/বুলেট ছোটে
বরফের/বুকে স্নিগ্ধ/পায়ের ভারে
মুক্তার মতো বরফের কুচি ওড়ে
সামনে গোলাপমুকুটে জড়ানো মাথা
মানবপুত্র খৃষ্ট, পরিত্রাতা।

রুশদেশে ১৯০৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লবের পর স্টলিপিন প্রতিক্রিয়া ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে স্বাধীনচেতা লেখকদের প্রায় ঈশপীয় ভাষায় কথা বলতে হতো। আর সেই প্রতিক্রিয়ার শাসন-বিকৃতির বিরুদ্ধে ঘনিয়ে উঠেছিল যে ক্রোধ, ব্লকের কবিতায় তার রূপ ধরা পড়েছিল প্রতীকী রহস্যময়তার এক নন্দিত সুষমায়, দেবকুমারীর সৌন্দর্য প্রতিমায় ও বিষাদে। সেই প্রতীকবাদী ব্লক এসে দাঁড়ালেন বিপ্লবের মঞ্চে। ১৯১৭-এর সাতুই নভেম্বরের মহাবিপ্লবের কয়েকদিন পর আনাটোল লুনাচারস্কি রুশ বুদ্ধিবাদীদের যে সভা ডেকেছিলেন, তাতে যোগ দিয়েছিলেন মাত্র গুটি কয় ব্যক্তি। আলেকজাণ্ডার ব্লক সে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি একদা প্রতিক্রিয়ার প্রতিবাদে হয়েছিলেন প্রতীকবাদী, বিপ্লবের যুগে হয়েছিলেন সাচ্চা বিপ্লবীই।

রিলকেও বলছেন অন্তর্বর্তীতে কবির পদপাতের কথা তুইনো চতুর্থ এলিজিতে—

তবু আমাদের নিঃসঙ্গ পরিক্রমণে, আমরা খুশি হই
যা টিকে আছে তারই জন্যে, আর আমরা দাঁড়াই অন্তর্বর্তীতে
বিশ্ব আর খেলনার মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়
যেখানে শুরু হয় সবচেয়ে প্রাথমিক সূত্রপাত
যা শুদ্ধ ঘটনা বলে ঠিক ছিল।

তাই প্রতীকবাদীদের উত্তরাধিকারী কবি-বিদ্রোহী দাদাবাদী লুই আরাগঁ সুররিয়ালিজমের সেতুবন্ধে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত হয়ে যান কমিউনিস্ট। এমন কি প্রতীকবাদী রুবেন দারিওর একদা অনুসারক পাবলো নেরুদাও চলে যান আরাগঁর পথেই।

কিন্তু 'শুদ্ধ' কবিতা-যে-কি সে-বিষয়ে কি সত্যিই কোনো সংজ্ঞা পাওয়া গেল? কবিতাকে পুরোপুরি কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা হতে হবে, এই দাবিটিও কি অর্থচরিতার্থতায় পাওয়া গেল? কবি কি দাঁড়িয়ে রইলেন একই স্থাণু মঞ্চে?

আসলে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচলিত ঘরানার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া থেকেইতো নতুন কাব্যপন্থার জন্ম হয়। ·উনিশ শতাব্দী জুড়েই যেমন পশ্চিম ইউরোপের দেশে-দেশে পুরনো সমাজ ভাঙছিল, আসছিল পুঁজিবাদ। আর তার সঙ্গে আসছিল শক্তির মদমত্ততা। আলবের্ত শ্বোহ্বাইৎজার বলেছিলেন, ইউরোপের নবজাগরণের অন্বিষ্ট ছিল এক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ—সাংস্কৃতিক তাৎপর্যেই ছিল সভ্যতার নতুন দীক্ষা গ্রহণের অন্বেষণ। কিন্তু একদিকে নীৎসে-তাঁর শক্তি-মদমত্ততার তত্ত্বে, সাংস্কৃতিক অন্বেষণকে মুখ্য না করে নিয়ে এলেন সুপারম্যানের মূর্তি, যার সামনে সাধারণ মানুষ যেন পশুপাল। অন্যদিকে মার্কসবাদ, সাংস্কৃতিক উজ্জীবনকে মুখ্য না করে সমাজবিপ্লবকেই অন্বিষ্ট করে তুলল। শ্বোহ্বাইৎজারের মতে তাই শিল্পীদের নিজেদের পরম একাকীত্বের পথ ছাড়া আর কোনো পথই খোলা রইল না। তিনি কিন্তু মার্কসবাদকে একপেশে চোখেই দেখছেন। মার্কসবাদ তো সমাজবিপ্লবের মধ্যদিয়ে মানবিক অনন্বয়মুক্ত হয়ে মানবিক সংস্কৃতির অভ্যুদয়ই আকাঙ্ক্ষা করে থাকে! এ-যুগ কেবল তো ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হুগো ও মালার্মেরই যুগ ছিল না, এ-যুগ হুইটম্যান, ব্রাউনিং ও র‍্যাঁবোরও যুগও ছিল। ছিল বোদলেয়রেরও।

সিম্বলিস্টরা 'শুদ্ধ' 'শুদ্ধ' বলে বড়ই বেশি ভেবেছিলেন। বাওরা তাঁর 'দি ক্রিয়েটিভ এক্সপেরিমেণ্ট'-এ যেমন বলেছেন শেষ পর্যন্ত "কবিতার একটি বিশেষ ধারা অবশ্যই আছে, যা শুদ্ধতর, কেননা যাকে কবিস্বভাবী মনের সঙ্গেই নির্বিশেষভাবে সম্পর্কিত বলে ধরা হয় আর যা মহান রচনাকার হুগো এবং টেনিশন যে গদ্য উপকরণ নিয়েছিলেন, তা থেকে বিবর্জিত। সিম্বলিস্টরা এ দিকেই বেশি নজর দিয়েছিলেন নীতিবাদী didactic বা অলঙ্কারবাহুল্য অথবা কল্যাণবাদী সব কিছুকেই অকবিতা জ্ঞান করে পরিত্যাগ করেছিলেন।" পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতীকবাদের নামেও ছিল তা সত্ত্বেও 'শুদ্ধ'পন্থীদের এক বিদ্রোহ। আজকের যুগের 'শুদ্ধ' কবিরা অবশ্য ভিন্নতর মতাদর্শী।

এখনকার দিনে 'শুদ্ধতা'র সীমা আরও দূর পর্যন্ত প্রসারিত। এই শুদ্ধ কবিতা-তাত্ত্বিকদের বক্তব্য, কবিতা বিশেষ এক ধরণের চমক বা থ্রিল দেয়। এই চমকই নাকি কবিতাকে অন্যবিধ শিল্পকর্ম থেকে তফাৎ করেছে।

হোমার-বাল্মীকি-ভার্জিলের মতো যে-কোনো কবিইতো ঐ থ্রিলের অভিজ্ঞতা দিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা ঐ থ্রিলের সঙ্গে সঙ্গে অন্য জগতেরও সন্ধান দিয়েছেন। কাহিনী-কথন থেকে আবেগ, কামনা সব কিছু নিয়ে জীবনের সমালোচনা-সহ চিন্তার নানা উপাদানের সঙ্গে পাঠককে তাঁরা সম্পর্কিত করেছেন। অতি আধুনিক 'শুদ্ধ' কবি বলবেন, কবিতা এ-সব কারণেই কবিতার কাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। কেননা, ঐ সব নানা বিষয় পাঠককে বিশেষ উত্তেজনা, চমক বা থ্রিল থেকে সরিয়ে নেবে। একেবারে নিরঙ্কুশভাবে ধী, চিন্তা, আদর্শবাদ, সমাজমনস্কতা সব কিছু থেকেই কবিতা দূরের ব্যাপার হওয়া দরকার। একটি বিশেষ রং যেমন তা আদর্শায়িত না হলে, কেবল মাত্র সাধারণ রং মাত্র। কোনো a priori অর্থ যদি বর্ণের না থাকে, রং-এর একটি বিশেষ সমাবেশই দর্শককে বিশেষ থ্রিল দেবে। সে দর্শক কোনো আদর্শবাদিতায় ইতিমধ্যে যদি দীক্ষিত না হয়ে থাকে, তবে শিল্প, নিছক শিল্পের গুণেই তাকে চমক এনে দেবে। শুদ্ধ কবিতাও নাকি ঠিক তেমনি চমক দেবে আদর্শবিধৃত না হয়ে।

নীৎসে ট্র্যাজেডি আলোচনা প্রসঙ্গে একদা দু'ধরনের কবিতার কথা বলেছিলেন। অ্যাপলো-অনুসারী ও ডায়নোসীয়। তাঁর মতে মানুষের প্রয়োজন দু-ধরনের কল্পনাবিধৃত দৃষ্টিভঙ্গিই। অ্যাপলো-অনুসারী কল্পনায় থাকবে সমাহিতি ও শৃঙ্খলার আদর্শবোধ, যা দিয়ে সব কিছুকে দেখা যাবে স্পষ্টভাবে, পরিস্কারভাবে।

অন্যদিকে ডায়নোসীয় কবিতা হবে মাতাল, উত্তেজিত, আবেশবিহ্বল, এক্সটাটিক। এ কবিতায় নেই দান্ত প্রশান্তি বা পরিচ্ছন্নতা। বরং থাকবে

"a strange sense of power and a narcotic influence which makes a man forget himself and identify himself with nature or the human crowd in its less rational and instinctive moods." এ কবিতা কোনো বুদ্ধিবাদী আলোয় ভাস্বর নয় কিন্তু এ কবিতার আছে 'a sense of more abundant life", হপকিনস যাকে বলেছিলেন inscape, যার সাহায্যে কবিতা 'ঘুলিয়ে তোলে নিজের মধ্যে এক ঘূর্ণি', বিশ্ব প্রবেশ করে অন্তর্লোকে instress-এর মধ্য দিয়ে।

আমরা দেখছি এই আত্মনেপদী উৎসার কবিতাকে সমাজবিচ্ছিন্ন ক'রে এবং ব্যক্তিগত চমক পাবার জন্য 'ক্লোজড রিডিং'-এর প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে কবিতাকে তার যোগ্য কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে। কবিতা তথাকথিত শুদ্ধ হতে গিয়ে, শুদ্ধতার নামে ছুঁচিবাইগ্রস্ত হিন্দুবিধবার মতো হারিয়েছে তার রমণীয়তা, হারিয়েছে কবিতাকেই। শেষপর্যন্ত মাদকতার প্রয়োজনে কবিই হয়ে পড়েছেন নেশাগ্রস্ত। বস্তুগত প্রপঞ্চের ঊর্ধে অন্যতর বিশ্ব আবিষ্কারের জন্য নানা ধরণের মাদক সামগ্রীর ব্যবহার তাঁর কাছে যেন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। মনস্তাত্ত্বিক ভুবনে নির্জ্ঞানকে ঘুলিয়ে তোলার জন্য বেড়েছে মাদকদ্রব্যের প্রতি মনস্কতা, এবং ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ কবিতার নামে শব্দ সজ্জার সাহায্যে একদা বিশুদ্ধ একটি চিত্র আঁকার চেষ্টা হয়েছিল; তারপর মানস উন্মোচনের নামে এসেছিল সিম্বলিজম। এখন এসেছে ডাইনোসীয় প্রমাদ। কিন্তু কবিতা কতখানি শুদ্ধ বা কতখানি বিশুদ্ধ হলো, এর সঙ্গে সমাজচিন্তার কি কোনো সম্পর্ক নেই? আর কবিতার আদিরূপে প্রত্যাবর্তনই যদি শুদ্ধতার দ্যোতক হয়, তবে কবিতার আদি উন্মোচনের দিকে চোখ ফেরালে অনেক কিছুই অ-বিশুদ্ধতার তাৎপর্যে এই তথাকথিত শুদ্ধতার ফাঁকি ধরিয়ে দেবে।

শুদ্ধ কবিতার উৎসে যেতে অবিশুদ্ধতায়

কবিতা মানব প্রজাতির অন্যতম প্রথম নান্দনিক শিল্প। যে-কোনো সভ্যজাতির পুরাণ-কাহিনী অন্বেষণ করলে দেখব কবিতা নামক এই আদি সাহিত্য-শিল্পটি ইতিহাস, ধর্ম, যাদুবিদ্যা, এমন কি মনুস্মৃতির মতো সমাজকানুন সব কিছুই ধরে বসে আছে। অবশ্য এ কবিতা আজকের বিচারের 'শুদ্ধ' কবিতা নিশ্চয়ই নয়। বরং একে বলা চলে উঁচুতারে বাঁধা উচ্চারণ বা হাইটেনড স্পিচ। এই উঁচু তারে বাঁধবার প্রয়োজনে যে গঠনরূপটি আমরা পাই তাতে আছে ছন্দ, মিল, যমক, সুসম পঙ্‌ক্তি বিন্যাস, সুনিয়মিত শ্বাসাঘাত, ধ্বনিসাদৃশ্য ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই কায়দাই সেই শব্দসজ্জাকে দিয়েছে এক বিশেষিত রূপ, এক রহস্যময়তার স্বাদ এনেছে, এনেছে যাদুকরী প্রভাব। পুনরাবৃত্তি, রূপকগ্রন্থনা এবং বিরোধালঙ্কার বা বিরোধাভাস, এ-সব কিছু নিয়ে আমরা যাকে মূলত কাব্যিক ব্যাপার বলি, ঐ শব্দ সংগঠন বয়ে এনেছে তেমনি বিশেষিত ও বিশিষ্ট শব্দ উচ্চারণ।

এই উঁচুতারে শব্দগাঁথার মধ্যেই আছে আদি কবিতার উন্মেষ। যৌথ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তা এমন এক আবেগঘন মত্ততা সৃষ্টি করত যে, বলা চলে ছন্দ স্পন্দনের মধ্যে রয়ে গেছে সেই উন্মাদনার উৎসমুখ। শব্দের সঙ্গে আছে আদি অভিজ্ঞতাগুলি। আদি অভিজ্ঞতার অভিনয় ও শব্দ উচ্চারণ একই কালে নৃত্য, অভিনয় ও কবিতার মাদকতার পূর্বসূরি। এ তৌর্যত্রিকে কবিতা ও সঙ্গীত ছিল অবিভাজ্য।

আধুনিক 'শুদ্ধ' ডায়নোসীয় কবিতা উৎস অন্বেষণ করেছে এই উন্মাদনার মধ্যে। সিম্বলিস্টরাও একদা শব্দে খুঁজেছিলেন প্রত্ন অতীতেরই আদি প্রতীক।

সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত বলবেন, প্রজাতি হিসাবে মানুষের আছে এক বিশিষ্টতা। সেই বিশিষ্টতারই পূর্ণ বিকাশ ঘটে তার শ্রমের মহিমায়। মানুষ শ্রম দিয়ে বিশ্বের আদল বদলিয়ে দেয়, আর বিশ্বকে বদলে দিতে দিতে নানা উৎপাদন-সংগঠনের তাৎপর্যে এবং বিশ্ব ও সমাজের অভিজ্ঞতায় বদলিয়ে যায় সে নিজেও। কিন্তু তার অন্বেষণ এমন মুক্ত মানবিক এক ব্যবস্থায় উত্তরণ, যেখানে সে পূর্ণ বিকশিত হতে পারে আপন শ্রমের মহিমায়।

অথচ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তাব ঠাঁই হয় নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডীতে। সে ঠিক যা হতে চায়, তা না হয়ে, হয়ে পড়ে এক-এক টাইপ। একদা যৌথ জীবন-চারণা ছিল তার প্রাথমিক শক্তি, তার আত্মরক্ষার বল। সে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে যৌথভাবে। ব্যক্তির বিকাশ সে সমাজে ছিল সমাজ-বিকাশের সঙ্গেই প্রোথিতমূল। প্রকৃতির ওপরে প্রভাব বিস্তারের জন্য তার আদি উপকরণ ছিল শ্রম। যৌথশ্রমের মধ্য দিয়ে, বুকের শ্বাস বেরিয়ে আসাকে ঠোঁট-দাঁত-কণ্ঠের নানা কায়দায় ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছে সে ধ্বনি। একেক ধ্বনির অর্থ একেক অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতাগুলি ধ্বনির বিন্যাসে যোগাযোগের বাহন করে নেওয়াতেই গড়ে উঠেছে শব্দ। শব্দের আদিরূপ তাই বস্তু ও কোনো মূর্ত ঘটনার প্রতিচ্ছবি। শব্দে যা বিমূর্ত।

একেকটি শব্দ উচ্চারণ একেকটি অভিজ্ঞতারই উন্মোচন ঘটায়। আর শ্বাস-মোচনের কায়দার মধ্যে আছে তার ছন্দ, যে ছন্দ তার নানা মাপের শ্রমঘন অভিজ্ঞতায় বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে নিরূপিত। তাই সে যখন কোনো ঘটনাকে শব্দ-সমাবেশে উচ্চারণ করেছে ছন্দের মাত্রায়, স্পন্দনের অনিবার্যতায়—যৌথ-উচ্চারণে তা হয়েছে অভিজ্ঞতারই এক বিশেষিত রূপ। সে চেয়েছে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি, বরং চেয়েছে প্রকৃতিকেই নিয়ন্ত্রণ করতে। প্রকৃতির সম্ভাব্য পরিপ্রেক্ষিতকে মানুষ চেয়েছে আয়ত্তে আনতে যেন যা ঘটতে পারে, তাকে কোনো কৃত্য শিল্পকলায় ঘটিয়ে দিয়ে তারপর তাকে অভিনয়ে আয়ত্ত ক'রে বা পরাস্ত

ক'রে জীবনের পন্থাগুলিকে নিঃসপত্ন করে তোলা যায়। হরিণ শিকারের সে অভিনয় করেছে, অভিনেতা হরিণটিকে বন্দী করবে বলেই।

প্রকৃতির অন্ধ শক্তিকে সে বুঝতে না পেরে তাকে দেবতা বানিয়েছে, মৃত্যুকে ব্যাখ্যা না করতে পেরে প্রেতের চিন্তায় সন্ত্রস্ত হয়েছে, আর এ-সব দেবতার জন্য তার উপাচার সাজিয়ে, শব্দগ্রন্থনা করে উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বলীয়ান হয়ে, তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে কখনো প্রণতি বা কখনো পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষায়। এই তাৎপর্যই বহন করছে তার আদিম শিল্প, কবিতা। কবিতা তাই মানুষের নির্জিত বোধ থেকে মুক্তির স্বাদ বয়ে আনে।

টিকে থাকার জন্য আদি উপকরণ তার শ্রম। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে নিরাপত্তাবিহীন মানুষ ছিল শুধুমাত্র প্রাণধারণের আপ্রাণ চেষ্টায় অস্থির। তার উদ্বৃত্ত হতো না কিছুই। তার শ্রমের মধ্যে মুক্তির স্বাদ ছিল না। প্রকৃতির বন্ধনে বন্দী মানুষের মুক্তির আঁকুপাঁকু চেষ্টার মাধ্যম ছিল তবু শ্রমই। কিন্তু মুক্তির স্বাদ ছিল অন্য কোথাও। ছিল তার নৃত্য-কৃত্য-কবিতায়। সে-যে মুক্ত হতে পারে তার ইঙ্গিত ছিল কবিতার মধ্যে; প্রচুর খাদ্য, শ্বাপদজয়ী অস্তিত্ব, প্রেত বা প্রকৃতি দেবতার ভীতিকে জয় করে তার জীবনচারণা—সবকিছু যেন এক কল্পবিজয়ের মধ্যে নিহিত। তাই তার কবিতা। তার উঁচু তারে বাঁধা শব্দগ্রন্থনা তাকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে উন্মোচিত করে। কবিতা ছিল তার স্বাধীনতা। স্বাধীনতাই কবিতার প্রাণসত্তা।

কবিতার অনেক বদল হয়েছে তারপর। এসেছে মহাকাব্য যেমন ইলিয়াড-অডিসি যা ট্রাইবাল সমাজের অনন্বয় উত্তীর্ণ হবার কল্পভুবন। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে আছে দাসপ্রথার শ্রেণী সমাজের মানবিক যন্ত্রণার বিশ্ব—যে বিশ্বের অ্যালিয়েনেশন উত্তীর্ণ হবার পথ না-জেনে কারণ হিসাবে ধরা হয়েছে নিয়তিকে। গ্রীক ট্র্যাজেডির সেই কালে অর্থাৎ দাসযুগে মুদ্রা-বিকাশের ফলে, গোটা সমাজজীবনে যে প্রাণান্তিক ধনসঞ্চয়ের

প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তারই ফলে 'মানুষই টাকা' বলে দাসকে চিহ্নিত করা হতে থাকে। স্বাভাবিক সমাজের মাথার উপরে চড়ে বসে তখন টাইরনস, যার বংশ পরিচয় অজ্ঞাত, যার ধনসঞ্চয়ের জন্য পুরুষকার একমাত্র সম্বল, আন্তিগোনেতে যাকে পাই "বহু আছে বিস্ময়ের আর শঙ্কার বিষয়, কিন্তু মানুষের চেয়ে নেই বড় কোনো বিস্ময় বা শঙ্কার কিছু।"

সে মানুষটি যেমন ইদিপাসে হয়ে যায় 'প্রথম মানুষ' থেকে একেবারে 'সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত'! যৌথ-সমাজের বাইরে ব্যক্তিস্বার্থকে উত্তুঙ্গে তুলে ধরার ফলেই আসে সেই বিপরীত, উত্থান থেকে অধঃপতন। 'প্রশ্নকর্তা হয়ে যায় প্রশ্নের বিষয়, শিকারী হয়ে যায় শিকার, চিকিৎসক বদলে যায় রোগীতে, অপরাধ অনুসন্ধান-কারী নিজেই হয়ে পড়ে অপরাধী, ব্যাখ্যাকারী হয়ে যান ব্যাখ্যাত স্বয়ং, অন্বেষক হন নিজেই অন্বেষিত, আর পরিত্রাতা হয়ে পড়েন নিজেই পরিত্রাণের বিষয়। সক্রিয় থেকে বদল ঘটে নিষ্ক্রিয়তায়।"

এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডেও এসেছিল অনেকটা এই একই বোধ। এসেছিলেন শেকসপিয়র। শেকসপিয়রের নাটকের এমনকি কোনো গানকে আলাদাকরে দেখলে, উদ্দেশ্যহীন কবিতা বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু গোটা নাটকের সঙ্গেই তার সম্পর্ক।

মার্কেণ্টাইল পুঁজির সেই প্রবল বিস্ফোরণের যুগে, মূলধন সঞ্চয়ের আদি অবস্থায় একই সময়ে ব্যক্তি হয়ে পড়েছিল চরম স্বার্থপর, অপর দিকে নতুন বিজ্ঞান-বিকাশের মহার্ঘ পরিণতিতে 'বিউটিয়াস' হয়ে উঠেছিল মানুষই। তবে নিয়তি নয়, ব্যক্তির ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী করা হয়েছে এ যুগে ব্যক্তিরই নিজস্ব খুঁতকে। তার নিজস্ব বিকৃতিকে। তবে পরিপূর্ণ বুর্জোয়া অ্যালিয়েনেশনের সবচেয়ে মহার্ঘ সৃষ্টি উপন্যাস। কর্পোরেট শোষণ আর ব্যক্তির চূর্ণিভবনের যুগে নতুন শিল্প আঙ্গিক এসেছে একালের চলচ্চিত্র।

আসলে এপিকের একাংশ রূপ পরিগ্রহ করেছে উপন্যাসে। তার কাহিনী অংশকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটক। কিন্তু কবিতার মৃত্যু হয়নি। বরং যতই নতুন অ্যালিয়েনেশনের সম্মুখীন হই, ততই কবিতার রূপ বদল হয়ে যায়। আদি যাত্নকরী কাব্য থেকে বিকশিত হয় এপিক, এপিকের পর ট্র্যাজিক নাটক। গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে গীতিকবিতা। গীতিকবিতা বা ক্লাসিকাল কবিতা যাই হোক না কেন অন্যতর নতুন আঙ্গিকগুলিতো তাদের উৎসমূল হতে পারে না!

বরং এগুলির আদি জননী কবিতাই। অথচ কবিতা এখনও সার্বভৌম। কেননা, কবিতাতেই আছে সবগুলি অনন্বয়কে উত্তীর্ণ হবার উপকরণ। তাই কবিতা মরেও মরে না। নতুন ভাবে বেঁচে ওঠে। কেননা মনের মধ্যে যে জটিল বিন্যাস রয়েছে, যে বিন্যাসকে মন্থন করে উঠে আসে কবিতা, তার লক্ষ্য থাকে মুক্তি, স্বাধীনতা। অস্তিত্ব থেকে অন্তঃসারে যার অভিযান। ফলে কবিতার মধ্যেই রয়েছে এক সেতুবন্ধ—যা অন্য শিল্প-আঙ্গিকে নেই।

শ্রম প্রয়োগের মধ্যদিয়ে মানুষ যে কার্যকারণের অন্ধকার আবর্ত থেকে মুক্ত হতে পারে, তার প্রথম প্রকাশ ছিল আদিম সাম্যবাদ ও দাস যুগের সন্ধিক্ষণে যাত্নবিদ্যার মধ্যে। মানুষ তার অন্তঃসারের দিকে অভিযাত্রার পথে কবিতায় পেয়েছে তার প্রাথমিক প্রকাশ। দাস যুগে এ-অন্তঃসারের প্রতি যাত্রা ছিল আরও উন্নত, মধ্যযুগের অবসানে নতুন মানবিকতার বিজয়ে মানুষের স্বাধীনতা হয়েছে আরও বেশি চরিতার্থ কবিতাতেই। পুঁজিবাদের বিকাশময়তার প্রাথমিক যুগে মহান রোমান্টিকদের ছিল যান্ত্রিক বস্তুবাদের মানসিকতাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষেরই বিজয় ঘোষণা।

বরং যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বৈভবে ও প্রাণময়তায় অনন্বয়-গুলিকে কবিতা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে চায়। তাই প্রতিযুগে যে সদ্যতন শিল্পআঙ্গিক গড়ে ওঠে, তাও সার্থকতার লক্ষ্যে পৌঁছতে কবিতাকে

এড়িয়ে যেতে পারেনা। নানা শিল্পআঙ্গিকের উপস্থিতিতে কবিতাই হয়ে থাকে সাবভৌম।

যেহেতু মানুষের আপনাকে জানা কখনো ফুরোয় না, শেষ হয়না তার শ্রমলাঞ্ছন অন্তঃসার আবিষ্কারের মহামহিম অভিযান। তাই কবিতার মৃত্যু হয় না। এমন-কি আজ যখন মানুষ মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনের অভিযাত্রী হয়েছে, মহাবিশ্ব ও মানুষের অনন্বয়কে উত্তীর্ণ করে নিয়ে যাবার বাহন ও আজকে অন্যতম শিল্পকর্ম তাই কবিতাই।

কীটস তার ভাইদের কাছে ২৮. ১২. ১৮১৭তে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তার কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। "অনেকগুলি বিষয় আমার মনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবে আসছে। এবং হঠাৎ আমার মনে হলো বিশেষভাবে সাহিত্যে অবদানরাখা যোগ্য ব্যক্তিটির বিকাশের জন্য কোন গুণটি দরকার, যা শেকসপিয়রের দারুণভাবে আয়ত্তাধীন ছিল। আমি বলতে চাইছি নিগেটিভ কেপেবিলিটির কথা। অর্থাৎ কিনা কোনো মানুষ নিজেকে অনিশ্চয়তা, রহস্য, সন্দেহ ইত্যাদির অন্তর্ভুত হবার মতো যোগ্য করে তুলতে পারে, ঘটনা ও যুক্তির মধ্যে প্রবেশ করেও বিরক্তিকর অবস্থায় উত্তীর্ণ না হয়ে, অর্ধজ্ঞানের মধ্যে থাকার অবস্থায় না থেকে।" আজকের দিনেও বহু জ্ঞানের জগতেও কবিকে অর্জন করতে হয় সেই নেগেটিভ কেপেবিলিটি আর এই উত্তরাধিকার কবিকে তথাকথিত পশ্চাদবর্তিতায় পিছিয়ে নিয়ে যায় না বরং তিনি হয়ে ওঠেন অনেক বেশি সজ্ঞান অথচ রহস্য উন্মোচন প্রয়াসী। অনেক বেশি স্বাধীনতার পথে উদ্‌বর্তিত।

'আদি প্রতীক' বা 'উন্মাদনা' নয় কবিতার অন্বেষণ মানাবক মুক্ত কবিতা তাই অনেকখানি অ-বিশুদ্ধ। প্রতীক তার লক্ষ্য নয়। বিশুদ্ধতা যদি প্রতীক অন্বেষণ হয় তবে কবিতা অ-বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধতা যদি কেবল উন্মাদনা হয় কবিতা যে-বিচারেও অবিশুদ্ধ। কেননা উন্মাদনা উত্তীর্ণ হয়ে তার উন্মোচন মুক্তির পথে। কবিতা হোক অবিশুদ্ধ

কিন্তু কবিতাই। কবিতা উন্মোচিত হোক মুক্তির অভিযানে। ক্লোজড রিডিং-এর সীমানা ভেঙে দিতে তা উন্মুখ হোক।

বরং 'অবিশুদ্ধ কবিতা'র বিষয়ে পাবলো নেরুদা বলছেন, "দিন বা রাত্রির কোনো-না-কোনো সময়ে জিনিষপত্রগুলির দিকে নিবিড়ভাবে তাকানো খুবই জরুরি ঃ সেই সব চাকা যেগুলি বিস্তৃত ধূলিময় অঞ্চল পাড়ি দিয়েছে, বয়েছে সব্জি বা খনিজদ্রব্যের ভারিভারি মালের ঝাঁকা, বয়ে এনেছে কয়লা-খনি থেকে বস্তা, ঝুড়ি, ছুতোরের যন্ত্রপাতির হাতল বা আঁংটা। সেগুলি মানুষ আর মাটির স্পর্শ নিয়ে ছড়িয়ে আছে উদ্বেল কবিহৃদয়ের শিক্ষা হয়ে। আস্তর গেছে ক্ষয়ে, মানুষের হাতের চিহ্ন আঁকা পড়ে আছে। এ-সব জিনিসপত্রের লাবণ্য কোনো-কোনো সময় শোকাবহ বলে মনে হয় কিন্তু সব সময়ই মনে হয় অচরিতার্থ, আর সেই লাবণ্য বাস্তবের প্রতি এমন এক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলে, যাকে হাল্কাভাবে স্বাভাবিকতায় মেনে নেওয়া যায় না।

"ব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত হওয়া স্তূপীকৃত দ্রব্যসামগ্রী, হাতের বা পায়ের ছাপ রয়েছে সেখানে মানুষের। সেগুলির ভেতরে বা বাইরে রয়েছে মানুষের স্থায়ী চিহ্ন—ওগুলির মধ্যেই জড়িয়ে আছে মানুষের নানা বিভ্রম।

"ও-ধরনের কবিতাই আমরা চাইছি, মানুষের হাতের শ্রমনিঃসৃত অ্যাসিড, ঘাম আর ধোঁয়ায় যা ভরে আছে, লিলি আর প্রস্রাবের গন্ধ একই সঙ্গে যাদের আছে জড়িয়ে, আমরা যে-সব কাজ আইনীভাবে বা আইন ফাঁকি দিয়ে করে থাকি সব কিছু দিয়ে ভেজানো, ক্ষয়ে যাওয়া কবিতা আমরা চাই।...

"মানুষের দেহের মতো খাবারের দাগে আর লজ্জায় জড়োসড়ো, কোঁচকানো ; দাগদাগালিতে ভর্তি, স্বপ্ন, জাগরণ, ভবিষ্যকথন, প্রেম বা ঘৃণার ঘোষণা, বোকামি, ধাক্কা খাওয়া, গ্রামীণ সারল্য, রাজনৈতিক বিশ্বাস, মেনে না নেওয়া সন্দেহ, নিশ্চিতি, সরকারী কর সব কিছু নিয়ে পুরনো কাপড়ের মতো অবিশুদ্ধ কবিতা।"

ছন্নছত্তা, শব্দের কোটানায়

একজন কবি কোনো শব্দ প্রয়োগের সময় যেমনভাবে শব্দটি বাজিয়ে নেন, আমরা পাঠক হিসাবে শব্দটি ঠিক তেমনি স্বাদে-সঙ্গীতে এমন-কি রূপ-গঠন আঙ্গিকে দেখে থাকি কি ? এক একজন কবিও এক একটি শব্দ বিষয়ে যে একই স্মৃতিলালিত অনুষঙ্গ স্মরণ করে থাকেন, এমন নয়। প্রতিটি শব্দের রূপ ও ব্যঞ্জনা নানা কবির কাছে নানা মাত্রার হতে বাধ্য। কবির কথাই-বা বলি কেন, যে-কোনো মানুষের কাছেই তাই বেশি বা কম।

শব্দগুলিতো সাধারণ সম্পত্তি, একটা মোটা অর্থ থাকে সব শব্দেরই। তেমন অর্থ সাধারণ অর্থমাত্র। কিন্তু শব্দের অনেকটা অংশই ফাঁকা. বা ফাঁপা। ফাঁকা অংশটি ভরাট করে নিই আমরা, ঐ শব্দটিতে আমাদের অভিজ্ঞতা লালিত অনুষঙ্গ দিয়ে, এমন-কি অনেকখানি কল্পনা মিশিয়েও।

আমাদের মনের অতলে রয়েছে যে অভিজ্ঞতার স্মৃতি নিয়ে ঘুমন্ত মঞ্জুষা, নতুন অভিজ্ঞতার ধাক্কায় তার মধ্যে মন্থন ঘটে যায়। সেই মন্থনই মনের মধ্যে ঘনিয়ে তোলে আবেগ। সেই আবেগ নতুন অভিজ্ঞতার অভিধা শব্দটিকে যখন স্মরণসঞ্চয়ে জমিয়ে রাখে—অনেকখানি কল্পনার রঙে-রসে সেটিকে ভিজিয়ে নিয়েছে, রাঙিয়ে নিয়েছে তা, শব্দটি আর নিছক নিরঙ্কুশ নির্বিশেষ বিমূর্ত 'সামান্য'মাত্র নয়। অনেকখানি তার শূন্যতা ভরে উঠেছে বিশেষ করে ব্যক্তি-আবেগ চিহ্নিত হয়ে মূর্তলক্ষণে। সব মানুষের কাছে শব্দ এমনিই। তবে কবির কাছে, কল্পনাপ্রবণ শিল্পীর কাছে, শব্দের ফাঁকা অংশটি ভরে ওঠে অনেক বেশি আবেগ, অনেক বেশি কল্পনায় রঞ্জিত হয়ে।

কবিতো কবিতা লিখেই খালাস। পাঠকের কাছে কি কবি ঠিকঠাক পৌঁছতে পারলেন ? পাঠক তার পরিচিত শব্দগুলিকে স্বসৃষ্ট ও

সামাজিকভাবে অর্জিত অনুষঙ্গের দাক্ষিণ্যেই চিহ্নিত করে বুঝে নিতে চাইবেন। তাঁর নিজের মতো করেই কবিতাটি বুঝবেন। কবি শব্দ সাজিয়েই কবিতা লিখেছেন। পাঠকের মনে পৌঁছে যাবার ব্যাপারে শব্দই সেতুবন্ধ। কিন্তু কবি যে-শব্দগুলি বিশেষ তাৎপর্যে সন্নিবেশ ক'রে এক বিশেষ অর্থ বহন করতে শব্দসজ্জাকে বাধ্য করেছেন, পাঠকের কাছে কি তার সবটুকুই পৌঁছালো ?

তবু এখানেই আছে কবিতা রচনার আসল মজাটুকু।

কবি আবেগ আর কল্পনাকে এক সাধারণীকরণে নৈর্ব্যক্তিক ক'রে তুলে, বিশেষকে সাধারণীকরণ ক'রে, ঐ সাধারণীকরণের সাহায্যে আবার বিশেষকে উন্মোচিত করেন। ঐ সাধারণীকরণের পথেই ঘটে পাঠকের সঙ্গে কবির পরিচয়। তারপর সাধারণীকরণের নৈর্ব্যক্তিকতার আলোয় পাঠককে দেখতে হয় কবির ব্যক্তিগত এবং কবিব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রকাশটিকে। আর এজন্য কবির শব্দ ও পাঠকের শব্দ—এ-দুই শব্দের অর্থেরও একটি সাধারণ যোগসূত্র থাকতে হবে। ঐ সাধারণটুকু সামাজিক শব্দ-অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া—ওটুকু শব্দকোষের অর্থ ছাড়িয়ে সমাজের মুখেমুখে অর্থের সাধারণ যেমন চলটুকু রয়েছে, ততটুকুই। বাকিটা পাঠককে আবিষ্কার করতে হয়। আর ঐ আবিষ্কারেই রয়েছে নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দ।

কবি যেমনভাবে বিশ্বের অনন্বয় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন, সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে পাঠকও আরো ভালোভাবে চিনতে পারলেন তাঁর নিজের মানবিক জগৎ। আরও একধাপ স্বাধীন হলেন তিনি, স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে গেলেন বলে। তাই কি আগেকার দিনে পাঠককে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী বলত! তাই কি এলিঅট ভালো কবিতা বোঝার মাপকাঠি হিসাবে 'আবেগগত-অভিজ্ঞতা সমূহের সংগঠন'কে এতখানি মর্যাদা দিয়েছেন? কবিতাকে বাহন করে কবিব্যক্তিত্ব থেকে কবির মুক্ত হওয়াকে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন ?

কবির কথা ছাড়লুম। অন্যতর কথাশিল্পীর কথাই ধরা যাক।

উপন্যাসকারের কাছে কবির মতো অতোখানি শব্দ সচেতনতা অনেক সময় আমরা নাও চাইতে পারি। তাঁর কাছেও রয়েছে শব্দ-সম্পদের বিশাল এক ভাণ্ডার। এই মহার্ঘ ভাণ্ডারের সঞ্চয় পরিমাণ থেকে তিনি অনর্গল বেছে নিচ্ছেন তাঁর উপকরণগুলি। যেমনভাবে সামান্য কায়দায় সমাজের গরিষ্ঠাংশ শব্দ সাজায় মনের ভাব অপরকে পৌঁছে দিতে, তেমনি ভাবে উপযুক্ত ও কাম্য পরিমাণের শব্দ দিয়ে বাক্য বিন্যাস করলেন তিনি। নতুন ভাবে শব্দসন্ধান করে নতুন ভাবে কথাও বললেন। আর এর ফলে শব্দগুলির যে পরিচিতিগত সামান্য ব্যঞ্জনা রয়েছে, তাও উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন অনেকখানি। সে-শব্দগুলি সমাজের যোগাযোগ-মাধ্যম পরিমাণমাত্র, কিন্তু শব্দগুলির যথার্থ ব্যবহারে তাদের অর্থগত দিকের গুণগত রূপান্তর ঘটে গেল।

লেখক বলতে আমরা তাই তাঁর চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি বাদ দিলে শৈলীকেও মর্যাদা দিচ্ছি। বলে উঠতে অস্বস্তিবোধ করছি না 'শৈলীই মানুষ'। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের মতো মনে পড়ে যায়, 'কেউ কি তার ছায়াকে এড়িয়ে কোথাও পা বাড়াতে পারে?' আর ঐ শৈলীতেই আছে আরেক মজা। আমাদের যেমনধারা মনের গঠন, শব্দগুলির সাজানোর কায়দায় সেই গঠনের মধ্যে লেখক কখনো কখনো ঘুরিয়ে দেন এক মন্থন দণ্ড। কল্পনা আর আবেগের উন্মোচন ঘটিয়ে দিলেন তিনি। উপন্যাস বা গল্পের এ মুহূর্তগুলিও কবিতারই মুহূর্ত। আমরাও তাই বিশেষ বিশেষ বাগভঙ্গি পছন্দ করি, কেননা ঐ গদ্যের মধ্যেও কখনো কখনো আমরা পেয়ে যাই কবিতার এক উপরি পাওনা। তাহলে তো শৈলীকেও ধরতে মনের সংগঠনটিকে গড়ে তোলার প্রয়োজন থাকে! আর এই মনের ভালোমন্দ বাছাইয়ের সংগঠনটিও রুচিশীল পাঠক মানুষটির গোড়াপত্তন করে।

আমাদের দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহিনীমূলক রচনারই বেশি আদর। শৈলী হয়তো তার তেমনধারা উন্নত নয়, কিন্তু আছে

ঘটনা পরম্পরার এক জট না-পাকানো নজির। তাহলে পাঠক কি শৈলী অনুসরণে কল্পনার উন্মোচন, বা আবেগের প্রকাশ পেতে চান না? তাঁরা হয়তো চান তা ঘটনার আঘাতের মধ্য দিয়ে, কেবলমাত্র শব্দ বা শব্দ সাজানোর মধ্যদিয়ে নয়। আমারতো মনে হয় রুচিশীল পাঠকের উপরি পাওনা ঘটে যায় বিষয়বস্তু আর আঙ্গিকের হরগৌরী মিলনে, শব্দের বিশেষিত সজ্জা আর ঘটনাপুঞ্জের যামলমিথুন বিন্যাসে। যেন তেন ভাবে ঘটনাচিত্রণের মধ্যেই যখন পাঠকের পরিতৃপ্তি, কবিতার কল্পনার বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে পা ফেলা তার তাহলে অসম্ভব। আর তাই আধুনিক বাংলা কবিতা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের কাছে দুরূহ, জটিল ও দুর্বোধ্য। শ্রী David Daiches একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে কবিতার নিজস্ব জনসংযোগের প্রশ্নটি কবিতার সংজ্ঞার মধ্যেই রেখে বলেছেন, "Poetry, in the largest sense of the word, is a unique method of making a unique kind of communication and it is the real or potential effectiveness of the communication which justifies the method, not vice versa."

পাঠক ও কবির মধ্যে যোগাযোগের কথা উঠলে বলতেই হয় দুর্বোধ্য হবার নানা কারণ রয়েছে কবিতার—অন্তত এলিঅট তেমনি সব কারণ দেখিয়েছিলেন। যেমন, কবির একেবারে ব্যক্তিগত দিক থাকতে পারে, যার ফলে তাঁকে দুরূহ ভাবে প্রকাশ করতেই হয়, কিংবা একেবারে আনকোরা নতুন ভাবে প্রকাশ করার জন্যেও যাঁদের নতুনত্বের সঙ্গে পরিচয়বোধ স্বাভাবিক মনে হলোনা, তাঁদের কাছেও কবিতাটি দুরূহ মনে হতে পারে। কিংবা পাঠক ধরেই নিয়েছেন, কবিতাটি দুর্বোধ্য। কোনো কবি হয়তো কবিতায়, এতদিনের চেনাজানা পদ্ধতির বাইরে যেন কিছুটা বাদ দিয়ে লাফিয়ে চলে গেলেন প্রসঙ্গান্তরে, পাঠক সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু বাদ পড়েছে, কি তার অর্থ কি তার

মানে—এসব নিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়তে পারেন। আমার অবশ্য এমন ধারনাও আছে, কোনো কবি নিছক চমকসৃষ্টির জন্যও দুর্বোধ্যতার মুখোস পড়ে নিতে পারেন। আবার দুর্বোধ্যতা আছে শব্দের মধ্যেই। সুধীন্দ্রনাথ 'সচরাচর' বা 'সামান্য' শব্দ ব্যবহার ক'রে লোকমুখের শব্দ থেকে ফিরে গিয়েছিলেন শব্দের সাধিত সংগঠনের উৎসমূলে। এখানে পাঠকের দোষ কোথায়? বুঝতেই হবে, কবি জাতিগত শব্দ-উত্তরাধিকারের অংশটুকু বাদে ফাঁকা অংশটি লোক-ঐতিহ্যের 'সামান্য' অভিজ্ঞতা ও নিজের কল্পনায় ভরে নিতে পারেন নি। কবি কি আর শব্দকোষে দেওয়া শব্দের মানেটাই নেবেন? তাঁর অভিজ্ঞতা-লালিত অনুষঙ্গ, মানের মধ্যে মানে, মানেরও নানা রংবদল—এসব ধরতে চাইবেন না?

১৯৪৫ সালে এলিঅট লিখেছিলেন "চতুর্দিকে সত্যিকারের যেমন কথাবার্তা হয়, সেই ভাষাই কবি তাঁর নিজের বিষয় হিসাবে নেবেন।" বলেছিলেন, "কবিতার সঙ্গীত হবে, তাঁর সময়ের সাধারণ কথিত ভাষার মধ্যেকার ঘুমন্ত সঙ্গীত।" ১৯৬০ সালে ডোনাল্ড হলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন "সব আধুনিক যোগাযোগের জনমাধ্যম এবং স্বল্প সংখ্যক মানুষ—তাদের কথা ও বাচনভঙ্গি বৃহৎ সাধারণ্যে চাপিয়ে দিলে চলতি ভাষার বিষয়ে কবির সমস্যা জটিল হয়ে উঠে।"

বেতারে অতিপ্রচলিত উচ্চারণ, ভাষণ বা চলচ্চিত্র-টেলিভিসনের শব্দোচ্চারণ সাধারণের লোকচর্চার জীবিত ভাষাকে প্রভাবিত ক'রে তাকে একেবারে সমমাত্রিক করে গড়ে তুলে কবিতার জন্য আবশ্যিক জীবন্ত উচ্চারণকে ধ্বংস করে দিতে পারে। দান্তে যেমন লোকমুখের ঐশ্বর্যে কবিতাকে উত্তীর্ণ করেছিলেন, কোলেরিজ বা ওয়ার্ডসওয়ার্থও পৌঁছেছিলেন একই বক্তব্যে। সিম্বলিস্টদের শব্দের উৎসে প্রত্যাবর্তনের অভীপ্সা শব্দের এই অমোঘ উত্তরাধিকারকে কি কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করেনি? কবিতা রচনায় লাতিন, গ্রীক, সংস্কৃতে ফিরে যাবার মানসিকতা তথাকথিত কি রাজসভা-ঘরানার সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করেনা?

কবির নিছক আলাপচারিতাতেও থাকে কবির কবিতার বাগ্‌ভঙ্গির কথঞ্চিৎ ইঙ্গিত। স্টিফেন স্পেণ্ডার 'ওআরল্‌ড উইদিন ওআরল্‌ড' আত্মজীবনী গ্রন্থে একটি জায়গায় এলিঅটের ব্যক্তিগত আলাপচারিতার প্রসঙ্গ তুলেছেন। যেমন এলিঅট খাদ্য গ্রহণের প্রশ্নে বলছেন 'I do'nt think I dare eat smoked eel', অথবা 'I dare not take cake, and jam's too much trouble', কিংবা আবহাওয়া প্রসঙ্গে বলছেন 'if I remember, this time last year, the lilac—'। অমিয় চক্রবর্তীর লেখা জেমস জয়স বিষয় একটি প্রবন্ধে, জয়সের শব্দ-উচ্চারণের ব্যাপারটি চমৎকার ভাবে বর্ণনা করা আছে। তাঁর সিলভারিমুনলেক শব্দগ্রন্থনা অথবা অমিয় চক্রবর্তীর নামকরণ অ্যামব্রস হুইলটারনার—সবকিছুই তাঁর গ্রন্থের কণ্ঠস্বরকে মনে পড়িয়ে দেয়। কবি যদি একটু বেশি 'সামাজিক' মানুষ হতেন, অর্থাৎ নানা পরিবেশে যদি আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটত, বোধ হয় তাঁর বাচন-ভঙ্গি ও কাব্যঅনুষঙ্গ বোঝা এতখানি কঠিন হতো না।

আজকাল দুরূহতার অন্যবিধ কারণ আছে। বেচারা কবি! তিনি আজ জনজীবনের শ্রমনন্দিত উৎপাদন-বিশ্বের সর্বস্তরের সঙ্গী নন। বরং দেখি তিনি না সমাজের একেবারে ওপর তলায়, অর্থাৎ কলকারখানা ব্যাপ্ত বিপনন সংগঠনের মস্ত বড় অফিসার এমন একটা কিছু কেউকেটা, না তিনি কৃষক বা মজুর। এদেশে তিনি মাস্টার বা কেরানি কিংবা সাংবাদিক। ফলে লোকমুখের উচ্চারিত শব্দে যে সামাজিক অনুষঙ্গের বীজটি থাকে যার ওপরে কবির গড়ে তোলার কথা কল্পনার বনস্পতি সেই শব্দের সান্নিধ্যে আসা, একেবারে দারুণভাবে তা আত্মস্থ করা—এসব কবির কাছে হয়ে উঠেছে দায়। শব্দগুলির মধ্যে তাই সামাজিক কল্পনার ভাগটুকু খুবই সামান্য, অধিকাংশটাই ভরাট কবির আত্মনেপদী কল্পনায়। ফলে শব্দের সামাজিক আর কবির ব্যক্তিগত—এ দুই অর্থের মধ্যে দূরত্ব গড়ে উঠছে আসমান জমিন। অথচ হবার কথা ছিল অন্য। সমাজেই আছে

লোকের মুখের শব্দে অনেকখানি ব্যঞ্জনা, ভরাট করার অংশ যে-টুকু কবির—তার পরিমাণ সমশ্রেণীভুক্ত সমজীবন চর্চার অন্তর্ভুক্ত কবির কাছে খুব বেশি হবার কথা নয়! কিন্তু তাই কার্যত ঘটেছে। ফলে শব্দ নিয়ে শুরু হয়েছে এক নয়া ব্রজবুলির ঘরানা। তা না কোনো ব্রজের শ্রমঘন অভিজ্ঞতার মহিমা বহন করে, তা না কোনো সমাজগোষ্ঠীর বুলি। এই শব্দচয়নেই আছে কবির পরাজয়ের প্রথম দিক। বাকিগুলির কথা এলিঅটতো আগেই বলেছেন।

ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের কথা বলতে গিয়ে পাঠক হিসাবে আমার ব্যক্তিগত শব্দকল্পনার কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ছে।

কবি যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন, যেগুলি অবশ্যই শত শত বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে, এবং সে ক্ষেত্রে ঐ শব্দগুলির একটি সামাজিক ভাবে উত্তরাধিকারও রয়েছে। এবং সে বিচারে প্রতিটি কবিতাই পাঠকের সম্মুখে মুদ্রিতভাবে উপস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা সামাজিক সম্পত্তি হয়ে যায়। ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ গানের প্রথম কলি—'সমুখে শান্তি পারাবার'।

ইতিপূর্বে আমাদের দেশের শব্দসঞ্চয়ে ঐ তিনটি শব্দই জীবিত ও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ঐ বিশেষ ছন্দে, 'সমুখে', 'শান্তি' ও 'পারাবার' এই তিনটি শব্দের এই বিশেষ বিন্যাস, যা ইতিপূর্বে আমাদের উক্তি সম্ভারের মধ্যে ছিলনা, কবিতাটি প্রচারের সঙ্গেসঙ্গে তা বাঙালি জাতির উত্তরাধিকারের আওতায় চলে এল। কিন্তু, যদি 'সম্মুখে শান্তি সমুদ্র' এরকম একটি উক্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হতো, তবে আরেক রকম একটি ব্যঞ্জনার উত্তরাধিকার জন্মাত। কেননা, 'সমুদ্র' শব্দটির মধ্যে যে তরঙ্গগর্জনের আভাস পাওয়া যায়, পারাবার শব্দটির উচ্চারণে ঠিক সেই রকম ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ আসেনা। অতএব, যদিও আভিধানিক অর্থে সমুদ্র, সাগর, বারিধি, লবণাম্বু, সিন্ধু, পারাবার, —প্রভৃতি প্রায়শই একই মূল্যে বিধৃত, তথাপি পরস্পরের মধ্যে

ব্যবধানগত দূরত্ব রয়েছে অনেকখানি। যেমন, আমার কাছে 'সমুদ্র' বলতে বোঝায় স্ফীতিশীল, তরঙ্গভঙ্গজাত গর্জমান জলরাশি, যার উত্থান যেন শিস্ যা 'স' অক্ষরটির পরিচায়ক, 'দ্র' তে যার ভঙ্গজাত ধ্বনি উপস্থিত; এই ব্যঞ্জনা 'সমুদ্র'-এর অন্য প্রতিশব্দে বিধৃত নেই। পারাবার শব্দটি আমাকে সব সময় চন্দ্রালোকিত, রূপালি, চঞ্চল, অথচ ব্যাপ্ততায় প্রায় স্থির, অসীম জলরাশির চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবি-অনুষঙ্গে লালিত শব্দটির প্রতিচিত্র যদি আমার মধ্যে যথার্থভাবে তাঁর পারাবারের অনুষঙ্গই চিহ্নিত করে, তবেই ঐ শব্দটির অর্থ সহৃদয়হৃদয়সংবাদী পাঠক হিসাবে আমার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব, নচেৎ নয়। পারাবারের একটি সমাজস্বীকৃত মানে অবশ্যই আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার অনুভবের ভূগোলে শব্দটির খানিকটা ব্যক্তিগত অর্থও আছে। টিকাটিপ্পনীতে কবিতাটির উপরে গবেষণা এবং তা থেকে উপাধি অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মতো করে বোঝা কী সম্ভব হবে!

অবশ্য কিছুটা পশ্চাদপদতাও ঐ পারাবার শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে রয়ে গেছে—বিকশিত সমাজে যা কাব্যরস গ্রহণে বাধাস্বরূপ। মানব-সমাজের উন্নততর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল শব্দগুলির মৃত্যু ঘটে। হয়তো একটি শব্দই সব প্রতিশব্দের রূপ পরিগ্রহ করে। শব্দ অনেকখানি সাধারণীকৃত 'সামান্য' হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বিকশিত আধুনিক সমাজে 'সমুদ্র' 'পারাবার' বিভিন্ন প্রতিশব্দের মধ্যে একটি অনন্য শব্দই অধিক গ্রাহ্য হবার কথা।

ভাষাবিজ্ঞানীর গবেষণার দাক্ষিণ্যে আমাদের প্রায় সবারই জানা যে, অধিকাংশ শব্দ, বিশেষভাবে আদিম সমাজে, কোনো দৃশ্যমান বস্তুর শ্রুতিমাধ্যমগত প্রতীক মাত্র। এবং কখনো কখনো প্রাকৃতিক ঘটনার অনুকরণে ঘটে শব্দরচনা, যা বস্তু বা ক্রিয়ার একটি বিমূর্ত রূপকল্পনা। শব্দ চিন্তা ও অপর ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের বাহন মাত্র। বহু

শব্দের মতো 'কাক' শব্দটি যেমন ঐ পাখিটির স্বরের অনুসরণে সৃষ্টি, 'ব্যাঘ্র' শব্দটিও কী প্রায় তাই? ইংরাজি 'ocean' বা 'gallop' শব্দদুটির প্রথমটিতে কি আমরা সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, হাওয়ার দীর্ঘ হাহা রব, এবং পরেরটিতে আমরা কি ঘোড়দৌড়ের একটি বিশেষ চাল শুনতে পাই না? আকাঁড়া শব্দ উদ্ভাবনের পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা শব্দরচনার বিশেষ নিয়মগুলি আলোচনা করেছেন এবং শব্দ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিয়মের বাঁধা সড়কও তৈরি হয়ে গেছে। সেই তৈরি সড়কের বাইরেও যে শব্দ তৈরি হচ্ছে না, এমন নয়। জীবনযাপনের রীতিনীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের গঠন, বর্ধন, বর্জন চলেছে। নিত্যনতুন অনুষঙ্গের শব্দগুলি সে জগতে মানিয়ে নেওয়াও হচ্ছে। জাহাজিদের পাড়ায়, বা বিদ্যুৎ-মিস্তিরি বা কারখানার মজুরের আলাপচারিতা শুনলে মনে হবে, কত 'হাঁস-জারু' শব্দ যেন উপভাষায় স্থান নিতে চলেছে। এবং আরও বিস্ময়কর যে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের তৈরি ছড়াগুলিতেও, প্রচলিত ছন্দের অঙ্কের মধ্যে এই নতুন প্রতীক মিলিয়ে নিয়ে নতুন কিছু তৈরি হয়ে যাচ্ছে। মনে হবে যেন সন্ধ্যাভাষায় সেগুলি রচনা করা হয়েছে। লোকজীবন নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁরা দেখিয়েছেন, একেকটি শব্দ বা বাগ্‌ধারার উচ্চারণ গোটা ঐতিহ্যের মানস-ব্রহ্মাণ্ড নাড়িয়ে দেয়, উন্মোচন ঘটায় আবেগ, স্মৃতি ও জীবনচেতনার।

প্রতিমুহূর্তে শব্দ রচনা যেমন চলেছে, তেমনি পাশাপাশি সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার পদ্ধতিও নির্মাণ হয়ে চলেছে। এই শব্দগুলির অনেকগুলিই সামাজিক হবার কৌলিন্য পেতে পেতে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে বা নতুন রূপধারণ করতে পারে। এই জঙ্গম জীবন-ব্রহ্মাণ্ডে দোলাচলের পটবিবর্তনে কত নতুন ছবি, কত মোটা দাগ, সূক্ষ্মদাগেরই না রেখাবৈচিত্র্য!

সামাজিকভাবে পাওয়া শব্দগুলির আপাততঃ উৎস পাওয়া গেল দুটি: (ক) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্জিত উচ্চারণগত বিমূর্ত প্রতীক এবং (খ)

বৈয়াকরণের নিয়ম অনুযায়ী শব্দ নির্মাণ। এদের সঙ্গে ঘটে দেশবিদেশের ইতিমধ্যে নির্মিত শব্দগুলির যোগাযোগ। এমনকি তাদের সংঘাতে গড়ে উঠে নতুন ব্যঞ্জনাসম্পৃক্ত উচ্চারণ। এসব শব্দগুলিও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বদলে যায়, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে অর্থেরও বদল ঘটে যায়।

কিন্তু এই শব্দসম্ভারের জগতে অনেক কিছু তুচ্ছ ব্যাপারও আছে। যে অনুষঙ্গগুলি আমরা লেখা শিখে তৈরি করেছি তাও এক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য। ধরা যাক, 'কুটীর' শব্দটি। উচ্চারণের তাৎপর্যে এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই শব্দটির শ্রুতিগত এবং বস্তুটির দৃশ্যগত অর্থ যা, তার সঙ্গে মুদ্রিত অক্ষরে ঐ শব্দটির পাঠজাত অভিজ্ঞতা প্রায় একটি চিত্রজাত অনুষঙ্গ নির্মাণ করে। যেমন, আমি মুদ্রিত 'কুটীর' শব্দটিতে, কলাগাছে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র শান্ত গৃহ দেখতে পাই। আমার কাছে 'ক' আড়াআড়ি খোড়ো চালের প্রতীক, 'ব'-এর অনুরূপ অনুকৃতি আমাকে প্রভাবিত করে। 'া' টি কলাগাছ। 'নাচ' বলতে যা বুঝি নৃত্য বলতে তা বুঝি না। 'নৃত্য' শব্দের মুদ্রিত চিত্রে যেন নাচের একটি ভঙ্গিমা চোখে পড়ে। বাংলা অক্ষরে 'ব্যাঘ্র' শব্দটিও এমনি। বাঘের একটি ছবি, এমন-কি 'র' ফলায় একটি ল্যাজও যেন চোখে পড়ছে এ শব্দটিতে। মানছি এ সবই illusion, কিন্তু চোখও তো স্মৃতি রচনা করে!

আরও গভীরে অবগাহন করলে বোঝা যাবে, আমরা এরকম অনেক শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ অনুষঙ্গ লালন করি। কেননা, যদিও কবিতাগুলি শ্রুতির জন্যই হয়ত একদা রচিত হতো, কিন্তু মুদ্রণের দাক্ষিণ্যে অক্ষরের সমারোহে আমাদের চোখে দেখার জন্যও যে তা রচিত হয় না, এমন নয়। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে রণক্ষেত্র থেকে অ্যাপলিনিয় পোস্টকার্ডে নানা ভাবে অক্ষর সাজানোর কায়দার মধ্যদিয়ে কবিতা উন্মোচনের নতুন নিরীক্ষা করেছিলেন। কবিতার পঙ্ক্তি বিন্যাসের মধ্যেও থাকে চোখে দেখার অনেকখানি। ই. ই. কামিংস-এর কবিতার

অক্ষর বিন্যাস এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এমন কি মায়াকভস্কির পঙ্‌ক্তি বিন্যাসও।

'রাক্ষস' বা 'দৈত্য' এই অতিপ্রাকৃত বিষয়দুটি ঠাকুরমার মুখের উচ্চারণে যতখানি ব্যঞ্জনাগত অর্থে ছিল, আজকের দিনের বালক-বালিকারা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের বইগুলির অদ্‌ভুত ব্লকগুলি থেকেই হোক, বা দেবসাহিত্য কুটীরের ধর্মপুস্তকগুলির রংচঙে ব্লক থেকেই হোক মোটামুটি এদের এক ধরনের রূপচিত্র কল্পনা করে নিতে পারে। তার্কিক ব্যক্তি বলতে পারেন এর দ্বারা উদ্‌ভাবনী শক্তি অনেকটা খর্ব হলো, কেননা ঐ উভয় ধারার ব্লকগুলিই নিশ্চয়ই খুবই উন্নত কল্পনার পরিচায়ক নয়। কিন্তু তবুও একথা বিশ্বাস করতেই হবে, রাক্ষস বা দৈত্য বলতে পশ্চিমী বালক যা বুঝবে, বাঙালি বালক তা বুঝবে না। কারণ, চোখে দেখার অভিজ্ঞতায় পৃথক পৃথক অনুষঙ্গ মুদ্রিত চিত্রের মাধ্যমে নির্মাণ হয়ে গেছে।

শব্দ সাজিয়েই কবিতা লেখা। শব্দগুলির সংস্থাপনা থেকে উদ্ভূত ধ্বনি সংগঠন আদি কবিতার ক্ষেত্রে প্রথমেই আবিষ্ট করার ক্ষমতা রাখত। শব্দ অনুসরণে উৎসে ফিরে গেলে, তা যে সাধারণত কোনও চিত্র অনুকরণ, আজ তা ভাষাবিজ্ঞানীদের কল্যাণে স্বীকৃত হয়ে গেছে। তাই কবি তাঁর শব্দসঞ্চয় বলতে, বিমূর্ত অর্থে চিত্রসঞ্চয়ও বোঝেন। স্মৃতির অনুগমন ছাড়া তাই কবিতাসৃষ্টি সম্ভব নয়। কবে আমি বেয়াল্লিশ সালে বাঁকুড়া শহরের এক উপান্ত সড়কে ঢলেপড়া সূর্যের রক্তিম আলোয় কটিবস্ত্র-সম্বল দৃঢ়পদ মানুষের দ্রুত এক মিছিলে ধূলো উৎসারিত 'শোভাযাত্রা' দেখেছিলাম—'৪২-এর আন্দোলন বলতে বই পড়ে আমি যে পরোক্ষ জ্ঞান পাই, বলাবাহুল্য, তার চেয়ে আমার বাল্যের চোখে দেখা সেই মিছিল প্রত্যক্ষভাবে অনেক বড় সত্য। মিছিল বলতে যা আমি বুঝি. শোভাযাত্রা বলতে তা বুঝি না, প্রসেশান কথাটা আমাকে তাও বোঝাতে পারেনা। তাই 'মিছিলে দেখেছিলাম

একটি মুখ' যদিও আমি পাঠ করি, 'মিছিল' এই বিশেষ্যটিতে বলাবাহুল্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় যা ভেবেছিলেন আমি তা ভাবিনা। 'মুখ' বলতে তাঁর কাছে যে ধারণা, মুখের এ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ, আমার কাছে আবার ভিন্নতর। তবু কবিতাটি আমি আমার মতো করে বুঝি।

আবার, শব্দ সাজানোর মধ্যেও এমন অভিজ্ঞতা বর্তমান থাকে যেক্ষেত্রে পাঠকের অনুশীলনও প্রয়োজন। 'চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে'তে আমি যা বুঝি, অপর কাউকে তা বোঝাতে পারবনা। শব্দ আমাকে সেই সেতুবন্ধন রচনা করে দিতে পারবে না, কিন্তু শব্দের মধ্যেই আমি ঐ অনুভবটি পেয়েছি। তাই শব্দসমূহের সীমাবদ্ধতা ও অর্গলমুক্ত প্রসারিত অসীমত্ব উভয়ই আছে। কিন্তু সামাজিক শব্দগুলি আভিধানিক অর্থে আলোচনা করলে সেই অসীম অর্থের হদিশ মেলেনা। যদিও সমাজের কথোপকথন অনেকাংশেই রূপক, বিশেষভাবে জমাট রূপক দিয়ে তৈরি। সেজন্যে পাঠকের অভিজ্ঞতা লালিত নিজের চিত্রজগতও নির্মাণ করে নিতে হয়।

প্রতিটি মানুষের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন বলে এবং কবি সবচেয়ে স্পর্শ-প্রবণ বলে—তাঁর অভিজ্ঞতার রসায়ন গুণগত এবং পরিমাণগত অর্থেও তীব্রতায় ভিন্নতর। তাই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা যখন তৎকালীন পাঠক-সমাজে দুর্বোধ্য বা দুরূহ বিশেষণে ভূষিত হয়েছে, পরবর্তীকালে তাঁর কাব্য-মহাবিশ্বে ভূমিষ্ঠ শিক্ষিত বাঙালি কবিতাপাঠকের কাছে কিন্তু দুর্বোধ্য বলে তা গণ্য হয়নি।

তবে কি কবিতা রচনা এবং তার মূল্যায়নে যুগের ব্যবধান থাকে? কেননা, কবি একটি শব্দে কী অর্থ প্রয়োগ করেছেন, তাঁর কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতায় সিদ্ধিলাভের পর সমাজ বুঝতে তা সক্ষম হয়। কবিতা হয়ে যায় দুরূহ, ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের বৈগুণ্যে; দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে সেই অনুষঙ্গের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় যথার্থ অর্থে হয়নি বলে। অবশ্য আধুনিক কবিতায় পার্সোনা বা কবির নিজস্ব কবি-মুখচ্ছদ ব্যবহার

এবং কবিতার অন্তর্নিহিত টেনসন, যাকে বিষ্ণু দে আততি বলছেন, এগুলিও পুরনো কাব্য-পরিমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত পাঠকের কাছে রীতি-মতো দুরূহ ও শকিং বলে মনে হতেই পারে।

তাছাড়া পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের স্থিতিস্থাপকতাও আছে। পাঠক যদি একটি বিশেষ ধরনের বাগভঙ্গিতে অভ্যস্ত হন, তবে ঐ বাগভঙ্গিতে লেখা কবিতাই বোধ্য বিবেচিত হবে। এমন-কি সমাজজীবনের ব্যাপ্ত অনুষঙ্গ তাঁকে কিছু কিছু ন্যায়শাস্ত্রও শিক্ষা দেয়। সুতরাং কবি যদি কোনো বস্তু বা ভাবরূপকে প্রতীক হিসাবে নতুন ভাবে ব্যবহার করার জন্য শব্দটিতে একটি বিশেষ অর্থ আরোপ করেন, তবে দুর্বোধ্য বলে সহজেই তা ধিক্কৃত হতে পারে। ধরা যাক, "শুকনো ডালে ফুটে আছে পুঞ্জ অন্ধকার"। এক্ষেত্রে কবি হয়তো শুকনো ডাল বলতে শুষ্কতাই বোঝালেন, কিন্তু স্বাভাবিক ন্যায়শাস্ত্র ঘোষণা করবে, শুকনো ডালে কিছুই প্রস্ফুটিত হয়না বলে। শুকনো ডালে কিছু ফুটে আছে শুনলেই নৈয়ায়িক পাঠক বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো প্রতিবাদ করবেন, কেননা ঘটনাটি অযৌক্তিক, তারপর যদিও বা 'ফোটা' ক্রিয়াটি মেনে নেওয়া হলো কিন্তু 'অন্ধকার' ফুটে আছে—এটা অবশ্যই গ্রাহ্য হবার নয়। হয়ত কবি বলতে চেয়েছিলেন, শুষ্কতায় একমাত্র হতাশাই পরম রূপ, কিন্তু আমরা শুষ্কং কাষ্ঠং যত তাড়াতাড়ি বুঝব—তা কি একটু 'অযৌক্তিক' শব্দসজ্জায় বোঝা সহজেই সম্ভব হবে! কেন সম্ভব হয় না তার জন্যে দায়ী পাঠকের মনের কবিতা-বোঝবার নক্সাটি।

আসলে সকল কবিতাই বিশেষ নক্সার মতো, বা সে অর্থে কলিংউড কথিত 'বিশেষ আঙ্গিক' বিধৃত। এ ক্ষেত্রে কবিতার বিমূর্ত রূপটি প্রায় সংস্কৃতির সমগোত্র। একটি বিশেষ সময়ে, বিশেষ দেশে, একটি বিশেষ গোষ্ঠির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানা ও জীবনচর্চায় আচরিত এবং আচরণে প্রায় স্বয়ংক্রিয়তায় প্রতিফলিত বিভিন্ন ধারণাগত প্রতীকসমূহের বিশেষ সন্নিবেশজাত বাস্তব ও মানসিক পরিমণ্ডলকে আমরা ঐ গোষ্টির সংস্কৃতি

বলে আখ্যা দিতে পারি। তা সত্ত্বেও প্রতিটি প্রতীকই অন্যগুলির উপর নানা মাপের প্রভাব বিস্তার করে বলেই, একই গোষ্টিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে রুচির অমিল চোখে পড়ে। বস্তুতঃ ঐ সংস্কৃতির ঐ বিশেষ রূপটিতো সহসা 'আপনাতে আপনি বিকশি' হয়ে গড়ে ওঠেনি! গভীরে রয়েছে তার আর্থনীতিক ভরকেন্দ্র। একটি পদ্ধতিব ভিতর দিয়ে ঐ রূপায়নটি সবসময়ই ক্রিয়াশীল। মুহূর্তে মুহূর্তে তার ভাঙন ও সংগঠন ঘটে চলেছে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে পরিবেশ ও পরিশীলন উভয়েই পরস্পরের উপর নির্ভনশীল।

পরিশীলন পরিবেশকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি পারিবর্তিত পরিবেশও পরিশীলনের মধ্যে মৌলিক ও গুণগত রূপান্তর সংঘটনে কৃতকার্য হয়। সুতরাং, সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্কৃতিও যদি পরিবর্তিত না হয়, তবে বুঝতে হবে ঐ সমাজের ব্যক্তিদের মানসিক অগ্রগমনের রূপটি স্থানু। এবং আর্থনীতিক মূল যদি সমাজের বহিরঙ্গ গঠনের নির্ণায়ক হয়, তবে আমরা তো স্বাভাবিক ভাবেই বলতে পারি, আপনার স্বার্থবিধৃত অর্থনীতিকে বজায় রাখতে প্রচেষ্টা চলবেই, অতএব মানসিক ক্ষেত্রে স্থানুত্ব অর্জন করাও সমীচিন গণ্য হবে। এবং এসটাব্লিশমেণ্ট তাকে আয়ত্তে রাখবার নানা প্রচেষ্ট চালাবে।

কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে তাই সংস্কৃতি এবং নতুন সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম প্রভৃতি আলোচনারও প্রয়োজন আছে। কেননা কোন সংস্কৃতির আধারে পুষ্ট কোন ব্যঞ্জনা স্বীকৃত বলে প্রচলিত এবং তার পরিবর্তন যথার্থই শকিং কিনা তা ভেবে দেখবার বিষয়। আমি যেমন বিশ্বাস করি উৎপাদনের মাধ্যমেই সামাজিক সম্পর্কগুলি নির্মিত হয়, এবং বিশেষ সামাজিক শ্রেণী বিশেষ আর্থনীতিক বিন্যাসের দাক্ষিণ্যে বাস্তব অর্থে জীবন ও জীবিকার তুলাদণ্ডে মানসিক পরিমণ্ডল রচনা করে; এই মানসিক পরিমণ্ডলের জন্য সক্রিয়ভাবে একজন মানুষ দায়ী নয়, বরং সে যদি সমাজশৃঙ্খলা বিষয়ে অচেতন থাকে, তবে সমাজের অদৃশ্য

শৃঙ্খলগুলি, তাকে অচলায়তনের কারাগারে বন্দী করে ফেলে। শিল্পকলা বাস্তব অর্থে কৃত্রিম, প্রাকৃতিক ভাবে পেয়ে যাওয়া উপকরণগুলি শ্রম ও মনীষার সাহায্যে উপযোগী করে তোলার মধ্যে শিল্পের পরিচয়। আর্ট ও আর্টিফিসিয়াল একটি মূল থেকেই এসেছে। এবং সচেতন সক্রিয়তা স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পীর কাছে অন্বিষ্ট।

ব্যক্তিগত ভাবে তাই আমি মনে করি আর্ট বা শিল্প উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা আছে। এমন কি সমাজ দ্বারা স্বীকৃত কালোচিত্য গুণান্বিত আর্ট ফর্মেও সমাজের সমস্ত মানুষই সমানভাবে সাড়া দেয়না। এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মগুলি কি সকল শ্রেণীর মানুষ বুঝতে পারে? সেজন্যে শিল্পশিক্ষা প্রয়োজন। মানুষকে প্রয়োজনের দাসত্বের ঊর্ধে তুলে নিয়ে যাবার মতো সামাজিক অবস্থা ও আর্থনীতিক বিন্যাসও রচিত হওয়া দরকার। নইলে শাসন ও শোষণাশ্রয়ী জগতে শিল্পের পরিমণ্ডল দিনের পর দিন সঙ্কুচিত হবে। হতাশ শিল্পীরা কলাকৈবল্য-চিন্তার চর্বিত চর্বণে রত হবেন, দর্শনে অযুক্তিবাদ, ইতিহাস বিচারে অনিশ্চিতিবাদ দেখা দেবে।

শিল্পের ইতিহাস মানুষের শ্রমের ইতিহাসের সময় থেকেই শুরু। সূত্রপাতের যুগে তা যত দুর্বোধ্য বা রহস্যময়ই হোক না কেন অভিজ্ঞতা লালিত অবধানের মূল্যে তা নিতান্তই বোধ্য। সেজন্য শিক্ষা, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাথমিক অর্থে অভিজ্ঞতার অনুশীলন এবং পরোক্ষ অর্থে ঐতিহ্য ও ইতিহাস পঠন-পাঠনজাত নিরীক্ষা ও অনুধাবন বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু ব্যাপ্ত সমাজের মানুষের শিক্ষামুক্তি অর্জন কি আমাদের ক্লিষ্ট, পঙ্কিল ও শোষণ-শাসনত্রস্ত ধনবাদী-সহ-সামন্তবাদী তথা পাঁজি-পুরোহিত ও বেনিয়াবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি দেওয়া পরিবেশে অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং অর্ধমানবিক জীবনে বেঁচে থাকা দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব?

এমনকি নিজেকে বোধগম্য ও বোধ্য করে তোলার প্রয়োজনেও কবিকে কি বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ করা থেকে বিরত করা যায়?

নৈর্ব্যক্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা ও আধুনিক কবিতা

আজকাল আধুনিক কবিতা আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রায়ই নৈর্ব্যক্তিকতা বা ইমপার্সোনালিটির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সকল কবিই কিছু না কিছু নৈর্ব্যক্তিত্বের গুণে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। তবু বিশেষ করে যাঁদের আমরা 'কঠিন' বা ডিফিকাল্ট কবি বলে মনে করি তাঁদের আলোচনায় ঐ ইমপার্সোনালিটি শব্দটি বেশি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত যোগাযোগের স্তর উত্তীর্ণ করে দিয়ে এঁরা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে সৃষ্টি সম্ভবপর করে তোলেন। আধুনিক বহু কবি অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা কীটসের চেয়ে কম ব্যক্তিগত কবিতা রচনা করেন না, তবুও বিশ শতকের অধিকাংশ এ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভাবশালী কবি এবং আমাদের আধুনিক অগ্রনায়কের নৈর্ব্যক্তিত্বের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। এবং সে অর্থে টি. ই. হিউমের নির্দেশপত্রানুযায়ী আধুনিক কবিতা অনেক বেশি শীতল এবং কঠিন বলে মনে হয়। ওদেশের অধিকাংশ উনিশ শতকীয় বা প্রাক্-'পুনশ্চ' রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার মতো এগুলি তপ্ত এবং ঘনিষ্ঠ নয়।

জর্জ টি. রাইট এমনধারা মন্তব্য করতে গিয়ে স্বভাবতই কবির ব্যক্তিত্বের কথাটি তুলেছেন। ওয়ালেস স্টিভেনস-এর কবিতা তাঁর মতে নৈর্ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত উদাহরণ। এলিঅট তো কবিতাকে বলেছিলেন, 'ব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তি'র বাহন। স্টিভেনসের এমন কবিতাও পাওয়া যাবে যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মানুষের ছায়াপাত যদিও-বা থাকে তবু কিছু বিশেষ রূপ, চিন্তার কোনও পাত্র, অথবা বিমূর্ত আঙ্গিকের প্রয়োজনেই তার ব্যবহার দেখা যাবে। মানবপ্রকৃতি সম্পর্কীয় মতামতও তাঁর সব সময়েই প্রায় বিমূর্ত রূপেই চোখে পড়বে :

Two things of opposite natures seem to depend
On one another, as man depends
On a woman, day or night, the imagined
On the real. This is the origin of change.

এমন কী তীব্রতার চরমতম মুহূর্তেও মানুষের সম্পর্ক চোখে পড়ে না :

Winter and Spring, Cold Copulars, embrace
And forth the particulars of rapture come.

আর এই নৈর্ব্যক্তিত্বের কবিতায় শেষ পর্যন্ত উত্তমপুরুষগত সর্বনামের একবচনও আর বেশি চোখে পড়ে না। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, নৈর্ব্যক্তিত্ববিধৃত কবিতা আবার সবচেয়ে স্বকীয় অর্থে ইনডিভিজুয়াল। এজন্য আমাদের শতকের এ্যাংলো-স্যাক্সন কবিদের মধ্যে ইয়েটস, এলিঅট, পাউণ্ড, অডেন, ডিলান টমাস এবং অন্যান্য আধুনিক কবির কবিতা সহজেই চেনা যায় কবির স্বকীয় বিশেষত্বের দাক্ষিণ্যে।

সুতরাং, কবিতার এই আপাতবৈষম্যের বিষয় আলোচনা করতে হলে 'ব্যক্তিগত কবিতা' বলতে আমরা কি বুঝব, সেই সমস্যার সমাধান পূর্বাহ্ণে প্রয়োজন। আর এ সমস্যার স্পষ্ট সমাধান ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ-না আমরা—একজন কবি কত 'রূপে' কবিতার মধ্যে বিরাজ করেন, তা অনুধাবন করতে পারি। বিশেষতঃ এই সমস্যার অস্তিত্বই ইংরাজি ভাষায় লিখিত উনবিংশ শতকের কবিতা ঢেকে রেখেছিল। ঐ শতকের কবিতা কোনো কবির বিভিন্ন মুখচ্ছদ কবিতার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে, মোটামুটি ভাবে এক করেই দেখাতে চেষ্টা করত। আজকাল কিন্তু কবি এবং কবির যে ব্যক্তিসত্তা কবিতার মধ্যে কথা বলে, তাদের উভয়ের মধ্যে তফাৎ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি কবিতাতেই কবির যদিও এই ব্যক্তিসত্তা উপস্থিত থাকেন, তবুও 'the poet' এবং 'his personae', এই উভয়ের বিচার পশ্চিমী দেশে আজ সমালোচনার ক্ষেত্রে অতি সাধারণ বিষয় হয়ে পড়েছে।

ব্যক্তিসত্তার সমস্যা মূলতঃ মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এক অর্থে মানুষকে আপাত অর্থে যা দেখব, সে তো তেমনটিই। সেই একই অর্থে কবিকে কবিতায় যেমনটি পাবো তাঁকেও তেমনটিই মনে করব। এই উভয় উদাহরণেই ব্যক্তি কি, সেটা ব্যক্তি কী করছে তারই উপরে নির্ভরশীল। যে মুহূর্তে তার ক্রিয়াকলাপ আমরা বিশ্লেষণ করতে যাই, তখনই আমাদের আলোচনা বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে। একজন ব্যক্তির একটি আর্ত স্বরধ্বনি অথবা অপর একজন মানুষের একটি নৃশংস কাজ, আমরা বিকৃত না করে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারি না। বিকৃতিহীনভাবে ঐ ঘটনা বা উক্তির বর্ণনা অবশ্য বাস্তব অর্থে অবিকৃত মনে হলেও, তাকে বিকৃত বলতে কোনও দ্বিধা নেই, কেননা পুরো পরিপ্রেক্ষিতের মানচিত্রে স্থিত করে ঐ ঘটনাটি আমরা বর্ণনা করছি না। ফলে 'বাস্তব বর্ণনাই' বাস্তবতার মূল্য হারায়। কোনো ব্যক্তির বিষয়ে কোনো মতামত পোষণ করতে হলে, ঐ ব্যক্তির পুরো আচরণবিধি আমরা অনুধাবন করে থাকি, এবং তাকে আমরা আমাদের বিশ্লেষিত এবং মূল্যায়িত অন্যান্য ব্যক্তি ও বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে এবং সম্পর্কিত করে তার স্থান নিরূপণ করি। কখনও আমাদের মতামত শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করে থাকি কখনও অনুচ্চারিত ভাবে মনে করে রেখে দিই। এবং আমাদের দর্শনের মৌলভূমি প্রতিনিয়তই এমনিভাবে পরিবর্তিত করে চলেছি।

ব্যক্তি, কবিতা এবং আদর্শ বা মত—বস্তু ও বিশ্ব সম্পর্কে প্রতিমুহূর্তে আমাদের বিশ্লেষণের মৌলস্থান পরিবর্তিত করে চলেছে। যে ব্রহ্মাণ্ড আমরা পূর্বে স্বীকার করে এসেছি, তাকেই পরিবর্তিত করছে। কবিতা বা শিল্পের ভূমিকা এখানে অসাধারণ। একটি কবিতার আঘাত ভাবজগতে যে উপপ্লব সৃষ্টি করতে পারে, ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ডে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের চেয়ে তা কম বিপ্লবাত্মক নয়। তাই নিয়ত বিস্ময়ের আবির্ভাবক্ষেত্রে আমাদের এই জীবন

একই বিষয়কে নানারূপে দেখবার জন্য তাগিদ সৃষ্টি করে। গভীরতম অর্থে বিশ্লেষিত হয়ে বস্তুবিশ্ব, এমন কী মেটাফিজিক্যাল বিষয়ও, ব্যক্তির কাছে স্পষ্টতর হয়ে আসুক—এই তার আকাঙ্ক্ষা। একটি কথার পেছনে তাই মনঃজগতের যে জটিল সংশ্লেষণী সত্তা গোপন রয়েছে, তাকে জানতে, সেই জটিল স্নায়ুপুঞ্জের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝতে আমরা বাস্তব অর্থেই অপারগ। তাই আমরা আমাদের মতো করে কবিতার একটি শব্দবাহিত ব্যক্তিগত অর্থ গ্রহণ করেই খুশি নই, তার মধ্যে আরও কি নিহিত রয়েছে তা জানতে চাই। কবিতার শব্দ অনুরূপ গভীর মূল্যে বিধৃত। অবশ্য দৈনিক ক্রিয়াকলাপের জগতে লোক-সাধারণ প্রতিটি শব্দদ্বারা যে চলতি অর্থ বুঝে থাকে, সেই সাধারণ অর্থের সীমাবদ্ধতা দিয়ে লোকচরাচরের আচরণবিধি বিষয়ে আমাদের ধারণা সৃষ্টি হয়। সেখানে শব্দটি যেন আগেকার দিনের চীনে মেয়ের ছোট্ট পা, প্রচলিত আচরণের শক্ত জুতো দিয়ে আষ্টেপিষ্টে মোড়া।

কবিতার শব্দ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। তার অর্থ যেমন উদার বিস্তারের দিকে ঝুঁকে থাকে, তেমনি তার গভীরতাও অসীম। তাই কবিতায় শব্দের ব্যঞ্জনার কথা সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা বলতেন 'ব্যঙ্গ্য' ও 'ধ্বনির' প্রসঙ্গে। শব্দের সাহায্যে কোনো মানুষকেই পুরো বোঝা যায় না। নিয়ত আবিষ্কারের অভিজ্ঞতার রঙ্গভূমিতেই তার পুনরাবিষ্কার ঘটে চলে। জর্জ টমসন তাঁর 'মার্কসিজম অ্যাণ্ড পোয়েট্রি'তে বলেছেন, "সব-ভাষাতেই আমরা দু-ধরনের কথা-বলা পেয়ে থাকি। সাধারণ কথা বলা, স্বাভাবিক ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৈনন্দিন যোগাযোগের বাহন। অন্যটি কবিতায় কথা বলা। এ মাধ্যমটি অনেক নিবিড়, কোনো কৃত্যের যৌথ প্রক্রিয়ার যা যোগ্য, অতিকল্পনাময়, ছন্দশরীরী ও যাদুকরী।... এ বিচার যদি সত্য হয় তবে বলতে হয় কবিতার ভাষা চলতি কথার থেকে অনেক বেশি আদিম, কেননা ছন্দ, সুর, বিপুল কল্পনা ইত্যাদি যা ভাষার মধ্যে বিধৃত সেগুলি এ ভাষায় উঁচু মাত্রায় ধরা থাকে।"

মানুষ যদিও-বা জীবনে বিস্ময়ের কামনা 'অলক্ষ্যেই করে থাকে, তবুও সাধারণতঃ যে অনুভবের দাক্ষিণ্যে ইতিমধ্যে সে মনোভাব বা মতবাদ তৈরি করে ফেলেছে, সেই অনুরূপ অভিজ্ঞতা-বিধৃত চিন্তার মানচিত্রেই তাকে স্থিত দেখতে চায়। কখনই মানুষ অতিবিস্মিত হতে রাজি নয়। কেননা অতি বিস্ময়ের ঝাঁকানি তার ইতিমধ্যে নিরূপিত জগত সম্পর্কে মনোভাবকে গোড়া শুদ্ধ নাড়িয়ে দিতে চায়। আর অধিকাংশ মানুষ সাধারণতঃ তাই অপরের মধ্যেও অতি নতুনের বিস্ময় দেখতেও রাজি হয় না বা তৈরি থাকেনা।

আমরা সবাই কোনো না কোনো নক্সার মধ্যে ফেলে সবকিছু দেখে নিতে চাই। তাই প্রতিনিয়তই বাস্তবতা আর ঐ নিরূপিত নক্সার মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। ফলে, নক্সার রূপরেখা বদলে যায়। একেবারে হতচকিত করে দেবার মতো নতুনত্ব দেখলেই চোখে লাগে, আমরা আনকনভেনশনাল বলে তাকে শিরোপা বা কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিই। শিক্ষা ও সমালোচনার জগতেও ঐ রকম নক্সার অস্তিত্ব দেখা যাবে। পণ্ডিতদের সুবিধার জন্য সাধারণ কয়েকটি বিষয়ের স্বীকৃতি দিয়ে যখন আলোচনার পথ তৈরি করা হয় এবং এক সময় সেগুলির পৌনঃপুনিক ভাবে একই ধরনের ও ধর্মের মূল্যবিচারে সবাই পটু হয়ে ওঠে—ঐ সাংগঠনিক ধারণার বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে আমরা তখন এ্যাকাডেমিক বলব।

আনকনভেনশনাল ও এ্যাকাডেমিক এই উভয় মেরুতে আবাসিকদের সংখ্যা নগণ্য। তবে, এ্যাকাডেমিক মেরুতে তাঁদের সংখ্যা বেশি। এবং সাধারণ মানুষের এ্যাকাডেমিক আলোচনার প্রতি সদানিয়ত সম্ভ্রমও বর্তমান। আনকনভেনশনালের প্রতি খোলা চোখে বিরূপতা দেখালেও গভীর অর্থে স্নেহ পোষণ লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যে বিপ্লব আসে তখন, যখন আনকনভেনশনাল এসে নক্সা-নির্ধারিত এ্যাকাডেমিকতার মূল ধরে উপড়ে আনতে চায়। সাধারণ মানুষের প্রীতি তখন তারই দিকেই সমধিক। এমন ঘটেছিল রেনেসাঁসের ইতালিতে

ব্যাপক অর্থে; আজও তা ছোটখাট মাত্রায় ঘটে চলেছে চিত্র-বিচারে, কবিতাবিচারে, গল্পরচনায়, সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ নিরূপণে। আবার পৃথিবীতে এলো বিপুল ধাক্কা রুশ-বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই, সংস্কৃতি ও সমাজ বিচারের মধ্যে সোভিয়েতে। এমন কি গোটা দুনিয়াতেই।

কবিতাও আমাদের অভীপ্সাকে অথবা বিস্ময়কে ব্যক্তি অথবা মতের মতোই আঘাত করে। আমরা কবিতাকে মেনে নিই অথবা অমনোনীত করি আমাদের প্রথা-সুনিপুণ মনোভাবের নক্সাসাপেক্ষ বিচারে। কখনও-বা কবিতার কোনো উপাদান, যথা, চিত্রকল্প, চরিত্র, প্লট বা ছন্দ ইত্যাদি—স্পর্শ ক'রে। আমরা যদি কবিতায় নতুনত্বের আবির্ভাব স্বীকার করেও নিই, তাও নিই সীমাবদ্ধতায়। জীবনে যেমন অতি নতুনত্ব মেনে নিতে পারি না, কবিতাতেও তাই। এবং কবির নটসত্তা, মুখচ্ছদ বা personae-র সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য।

যে কোনো চরিত্রের সহায়তাতেই কবিতা-কথন চলতে পারে বলে আমরা ধরে নিই। একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে হয়ত চরিত্র আহরণের বিষয়টি সহজ, কিন্তু কবিদের চরিত্র বাছাই করার ফলে ঐ চরিত্র-গ্যালারি আরও ছোট হয়ে পড়ে। সুইফ্‌ট যে চরিত্রের মুখে কথা বলান, শেলীর কবিতায় সে চরিত্র কথা বলে না। রবীন্দ্রনাথ যে চরিত্রের মুখে কবিতা বলান, জীবনানন্দ দাশের আহরিত চরিত্র তা থেকে হয়ে যায় একেবারে আলাদা। এই কুশীলবের তফাতই চেনা-জানা personae-র তফাৎ সৃষ্টি করে। এ-তফাৎ সৃষ্টি হয়, কবিদের নিজেদের মধ্যের তফাৎ, সময়ের ফারাক, বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা প্রভৃতির ফলে। তাসত্ত্বেও কবির personae বেছে নেবার পেছনে পাঠকের রুচিও কাজ করে। আবার পাঠকের রুচি, পাঠক ইতিমধ্যে যে personae-সমূহের সঙ্গে সাহিত্যকর্মে সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলির উপর নির্ভর করে বলে একেবারে আনকনভেনশনাল চরিত্র ব্যবহার কোনো একটি নির্ধারিত সময়ে এবং নির্দিষ্ট সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে সম্পূর্ণ শকিং বলে মনে হয়।

সুতরাং কবির কাব্যকথক চরিত্র—বা personae দুদিক দিয়ে সীমাবদ্ধ। এক, তাঁর পাঠকমণ্ডলীর চাওয়া বা অভীপ্সার উপর ; দুই, তাঁর নিজের নির্বাচন এবং তাঁর পাঠকের (এবং কবিরও) রুচিসাপেক্ষ এক বা একাধিক ভূমিকা। সুতরাং প্রায় ধাঁধার মধ্যে পড়ে যেতে হয় আমাদের। কেননা যদিও প্রতিটি মানুষকেই আলাদা ভাবে চিনে থাকি, বা চেনবার ভান করি, তথাপি তাদের আমরা সাধারণতঃ কিছু নির্ধারিত টাইপ অনুসারী রূপেই দেখতে চাই। যদিও প্রত্যেকেই আমরা আলাদা এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং তা সত্ত্বেও আমরা কিছু নির্ধারিত ভূমিকা পালন করতে অভ্যস্ত। একই বিবেচনায় কবি এবং কবিভূমিকা বা personae, পাঠক এই উভয়কেই 'চেনামুখ' বলে দেখতে চায়। প্রথমজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, দ্বিতীয়টি একটি টাইপ। উভয়কেই সে তার পঠন-পাঠন থেকে গড়ে নেওয়া ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে উৎসুক। সুতরাং কবিকেও এমন ভূমিকা নিতে হয় যা পাঠকেরও 'বোধগম্য'।

প্রতিটি পাঠকেরই যখন কবিভূমিকা বা কবিব্যক্তিত্বের (বা টাইপ) এবং কবির বিষয়ে ধারণা থাকে এবং প্রতিটি পাঠকের ধারণাই প্রায় কবি-ভূমিকাগত ব্যক্তিত্ব এবং কবি সম্পর্কে আলাদা হয়ে প্রায় নিরূপিত অবস্থায় থাকে, তার ফলে কবিতা বিচার এবং বিচারের ব্যক্তিগত আচরণবিধিও তফাৎ হয়ে যায়। তবে আচরণবিধি ও বিচারের নির্ধারিত কিছু টাইপ কোনো এক সময় গড়েও ওঠে। ফলে ঐ টাইপের আনুকূল্যে পাঠকেরা এ বিচারের সাধারণীকরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যুগে যুগে কবিতা বিচারের রীতি-নীতি বদলে গেলেও, প্রতি যুগেই কবিতাকে কবিতাই হয়ে উঠতে হয়। এবং যেহেতু কবিতা উক্তি, সেজন্য একজন বক্তার অস্তিত্ব মানতেই হবে। সেই বক্তাই কবিভূমিকা-সাপেক্ষ ব্যক্তিত্ব বা মুখচ্ছদ, কবির নটসত্তা বা personae.

প্রতিটি রচনাতেই উক্তির দুটি স্তর থাকে—প্রথমটিতে চরিত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, অথবা পরস্পরের সম্পর্কে নিরূপিত ঘটনা

অনুসরণ করে। দ্বিতীয় স্তরে লেখক পাঠকের সঙ্গে কথা বলেন। প্রথম স্তরে তিনটি চরিত্র যথা কে বলছে, কাকে বলছে এবং কী বলছে তাই লক্ষ্য করা যাবে। অর্থাৎ, একটি প্রেমের কবিতায় ধরা যাক এই তিনটি চরিত্র রয়েছে যথা ঃ

উত্তম পুরুষ ঃ প্রেমের কবিতার গায়ক

মধ্যম পুরুষ ঃ গায়কের প্রণয়িণী, যে শুনছে বলে ধরা হচ্ছে

প্রথম পুরুষ ঃ গায়কের প্রেমিকার প্রতি প্রেম।

উদ্ধৃত স্তরে কবির পটভূমিকা ও পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্র বা রূপ পাওয়া গেল। কবিকে তিনটি Personaeতে ভাগ হতে হলো।

কবিতার উপরের স্তরের বিষয় আমরা আলোচনা করলাম বটে, কিন্তু কবিতাটির গভীরে রয়েছে ঃ

উত্তমপুরুষ ঃ কবিতাটির রচয়িতা

মধ্যমপুরুষ ঃ পাঠকমণ্ডলী

প্রথমপুরুষ ঃ মানবিক সংরাগ, মানসব্রহ্মাণ্ডের একটি উপাদান।

কবি কবিতাতে 'আমি' সর্বনামটি ব্যবহার করলেও গভীরতমতলে আমির অর্থ, উপরের স্তরের আমির চেয়ে অনেক ব্যাপক ইমপারসোনাল এবং গভীর।

আধুনিক কবিতায় ঐ Poet এবং Personae উভয়ে দুইটি আলাদা তলে অবস্থান করে বলেই, কবিতা ক্রমশঃ দুইটি তলযুক্ত হয়ে পড়ে। উনিশ-শতকীয় কবিতায় কবি, Personaeর আবরণ ভেঙে নিজেকে সবলে প্রকাশ করতেন। তাই কবিতায় কবি এবং ভূমিকাচরিত্র একতলেই দেখা যেত। ফলে কবিতামাত্রই ব্যক্তিগত বা Personal হয়ে উঠত। আধুনিক কবিতায় তাই কবির কণ্ঠস্বর নয়, বরং কবি যে কবিতা রচনা করেছেন তারই স্বর শোনা যাবে। ফলে কবির ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা, অনুভব, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি একটি Personae সৃষ্টির মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়ে কবিতা হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত

অনুভব আর কবির অনুভব নয়, বরং কবিভূমিকা-সাপেক্ষ মুখচ্ছদেরই অনুভব। সেজন্য যতই কবির মুখচ্ছদ বিশিষ্ট রূপ নেয়, আমরা কবিকে নয়, ততই তাঁর রূপান্তরিত রূপই দেখতে পাই। সেই নটভূমিকা যতই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, কবিতা ততই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বা ইমপার্সোনাল হয়ে ওঠে। তাই ইয়েটস্, পাউণ্ড, এলিঅটের কবিতায় সেই দ্বিঘাত তল বা স্তর পাওয়া যায়। বিষ্ণু দের 'ক্রেসিডা', 'ওফেলিয়া', 'জল দাও' প্রভৃতি কবিতায় বা জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন', 'সুচেতনা', 'বোধ' ইত্যাদিতে এই দুটি তলের অস্তিত্ব চমৎকার ভাবে পাওয়া যাবে।

আধুনিক কবিতার আপাত দুর্বোধ্যতার জন্য এই দ্বিঘাততল অনেক পরিমাণে দায়ী। অনেক কাব্যরসিক বলে থাকেন, শুদ্ধ শিল্পের ক্ষেত্রে, যেখানে ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তি-নিরপেক্ষতাই অনেক বড়, সেখানে বিশুদ্ধির দাবিতে এই দুটি তলের কথা মেনে নিতেই হবে।

ওয়ালেস স্টিভেনসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হারমনিয়ম' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩-এ। কিন্তু তাঁর কবিতায় কি কেবল এলিঅট কথিত ব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তিই সামান্য অর্থে বিধৃত হয়ে রইল? রয় হার্ভে পিয়র্স তাঁর 'দ্য কনটিনুইটি অব আমেরিকান পোয়েট্রি' (১৯৬১)তে এলিঅটের সঙ্গে প্রতিতুলনা করে দেখিয়েছেন স্টিভেনসের কবিতায় আছে সেকুলার ও হিউম্যানিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি। পিয়র্স বলেছেন, স্টিভেনসের কবিতায় আছে কবিতাকে অতিক্রম করে যাবার ব্যাপার। বলেছেন 'In any case, it is for good and for bad, one of the most elaborate apologies for poetry conceived of in modern times. More important, it is as a consequence one of the most elaborate apologies for man." এই নৈর্ব্যক্তিকতা কি শেষ পর্যন্ত apologies for man বলেই গ্রহণ করব?

আমাদের দেশে রাবীন্দ্রিক কবিতার থেকে আধুনিক কবিতার তফাৎ

করতে গিয়ে আলোচকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাল, সময়, বাক, অতীত ইত্যাদির কথা বলে থাকেন। রাবীন্দ্রিক লিরিকে কবিকে অত্যন্ত স্পষ্ট উত্তমপুরুষাত্মক উচ্চারণে চেনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বিচারে আধুনিক, সেখানে ঐ দুইটি তল অনেকাংশেই বর্তমান। এবং সেখানে ব্যক্তিসাপেক্ষ কবিতা ছাড়িয়ে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কবিতা দেখা যাবে।

আমাদের দেশে আধুনিক কবিতার অবশ্য একটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা আছে। অর্থাৎ দুটি তলভিত্তিক নৈর্ব্যক্তিকতা আসা সত্ত্বেও, আমাদের বাংলা আধুনিক কবিতায় মানবকেন্দ্রিকতা প্রগাঢ় ও ব্যাপক-ভাবে সার্বভৌম। রবীন্দ্রনাথ মানবমুখীন উদ্বর্তনেই এসে পৌঁছেছিলেন আধুনিকতায়। তাঁর পরবর্তী কবিদের সাধ্য হয়নি এই মানবমুখীন ঐতিহ্যকে ডিঙিয়ে যাওয়ার। বলাবাহুল্য যে সমাজের বহুধাবিস্তৃত অনন্বর কবিতাকে মানবস্পর্শ-বিযুক্ত করার প্রয়াস চালায়, আমাদের দেশে সে সমাজ গড়ে ওঠেনি। বরং গড়ে ওঠবার আগেই আমরা পৌঁছে যেতে চাই অস্তিত্বের সংশয়মুক্ত সমাজে। সমাজতন্ত্রে।

নৈর্ব্যক্তিকতাকে নিয়ে তবু একটা প্রশ্ন রয়েই যায়। নৈর্ব্যক্তিকতাকে মনুষ্যস্পর্শবিরহিত বলে চিহ্নিত করলে, তাতে শিল্পের ভিত্তি সম্পর্কেই সংশয় থাকে। প্রকৃতি ও সমাজকে মানবিত করার পথেই থাকে শিল্পের মুক্তি। শিল্পতো মানবকেন্দ্রিক। সুতরাং স্টিভেনস-এর আলোচনায় যখন জর্জ টি. রাইট বলছেন মানুষই অনুপস্থিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর কবিতায়, পিয়র্স বলছেন তাঁর সেকুলারিটি মানব-কেন্দ্রিকতাকেই বর্জন করে যায় শেষ পর্যন্ত, তখন বলতে বাধা নেই আসলে এ নৈর্ব্যক্তিকতা মানুষের এক ধরনের অ্যালিয়েনেশনকেই রূপ দিতে পারে। মেনে নিচ্ছি, প্রায় বিজ্ঞানীর মতো কেউ কেউ মহৎ উপন্যাস বা কবিতায় মানুষকে তার অনন্বয়িত সত্তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। আর তখন হয় পাঠকেরও মানবিত স্বপ্নের উন্মোচন। সেখানে এ নৈর্ব্যক্তিকতা ব্যক্তির নিজস্ব পরবাসী সত্তারও উন্মোচন

ঘটায়। সে কবিতায় থাকে অনন্বয় থেকে উত্তরণের প্রয়াস। অর্থাৎ যদি কবি সচেতন হয়ে পড়েন এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে, তবেই তিনি নৈর্ব্যক্তিকতাকেও ব্যবহার করতে পারেন সামাজিক ও ব্যক্তিগত অনন্বয়কে উত্তীর্ণ করার কাজে।

অন্যপক্ষে অনন্বয় তো হয়ে পড়েছে শিল্পীরই আভ্যন্তরিক সংঘাত। সে সংঘর্ষ বাইরের বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা বহন করে আনছে অথচ যা বিশেষ-ভাবে ব্যক্তির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সাঙ্গীকৃত হয়ে আছে। যেন-তা তাঁর জীবনধারারই একটি অংশ হয়ে গেছে। আর সেজন্যে নিজের কাছেই কবি অনেকখানি পরবাসী হয়ে পড়েছেন। অনেক সময় কবি বুঝতেই পারছেন না যে, এই বিচ্ছিন্নতাবোধ বাইরের থেকে সামাজিক কারণের জন্যে তাঁর মধ্যে এসে পৌঁছেছে। না বুঝতে পেরে এ বিচ্ছিন্নতাকে 'চিরায়ত ভাগ্য', 'নিয়তি', 'ট্র্যাজেডি' ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করার চেষ্টাও চলেছে। আর এই বিচ্ছিন্নতাবোধ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয় বিচ্ছিন্নতাই, যাতে পাঠক কবির অনন্বয়িত সত্তাটুকুই চিনতে পারে। মানুষের অন্তঃসারে পৌঁছে যাবার কোনো ইঙ্গিত তাতে অনুপস্থিত থাকে বলে, অনন্বয়িত অস্তিত্বই মুখ্য হিসাবে দেখা দেয়।

কিন্তু অনন্বয় থেকে উত্তীর্ণ হওয়া ঢের কঠিনও। প্রকৃতি বা সমাজকে মানবিত করার অঙ্গীকার তাই সব সময় দেখা মেলে না। প্রকৃতি যেখানে মানবিত হয়ে পড়ে, যেমন কীটস-এর 'ওড টু অটাম্‌ন্‌'-এ তেমন প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয় পাওয়া যায় না এ সব কবির কাছে। 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচলখসা হাতে দীপশিখা' না হয়ে, সন্ধ্যা হয়ে যায় 'পেসেণ্ট ইথারাইজ্‌ড আপ অন এ টেবল্‌'। প্রকৃতি হয়ে পড়ে এমন ঊষর যেখানে মৃত বৃক্ষ আশ্রয় দেয় না, ঘাসফড়িং দেয়না স্বস্তি, শুকনো পাথর দেয়না জলের শব্দ।

বলাবাহুল্য, বুর্জোয়া সমাজে প্রকৃতি, সমাজ ও সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলির পৃষ্ঠপটে মহৎ শিল্পীদের কবিতা তবু মানবিত করার

শক্তি হিসাবেই কাজ করে যায়। এই মানবিতকরণ এমন রূপকল্পও ব্যবহার করে যা পাঠককে এক সাধারণ মানবতার সচেতনতায় পৌঁছে দেয়, উপনীত করে দেয় মন ও সংবেদনের শিক্ষায়। অর্থাৎ, এ কবিতার থাকে বাস্তবতাতে ভিত্তি। যেমন বিষ্ণু দে-র 'জল দাও'। যেমন নেরুদার 'মাচ্চু পিচ্চু শিখরে', এবং ইত্যাদি।

অন্যপক্ষে বিচ্ছিন্নতার কবিতা হয়ে পড়ে গভীরভাবে আত্মমুখীন। কবির একাকীত্বের সংবেদনকে রূপ দেবার পন্থা হিসাবে এ কবিতার পূর্বসূরি ছিল একদা চৈতন্যপ্রবাহ, প্রতীকতা, ইমপ্রেস্‌নিজম ইত্যাদি। বাইরের বিশ্বের অর্থহীনতা ও নৈরাজ্যকে মানস-ভারসাম্যে আয়ত্ত করার ব্যাপার ছিল যেন ঐ পন্থাগুলিতে। এই মানস-ভারসাম্য অথবা ভারসাম্য আবিষ্কারের টেনশন কবিতায় প্রকাশ পেয়ে যেন অনেক সময় ধারণা করিয়ে দিতে চায় যে বিষয়গত দিকে, অবজেকটিভিটিতেই প্রত্যাবর্তন ঘটছে। অথচ যে বিষয়গত বাস্তবতা তা মানবিত করার জন্য অঙ্গীকার করে, তা শেষ পর্যন্ত হয়ে যায় শারীরিক কিছু সংবেদনের প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্র। যেটুকু প্রাকৃতিক ব্যাপার তা যে মানুষ অনেকখানি আপনার বিশিষ্টতায় বদল ঘটিয়ে দিয়ে অন্যতর সুষমার জন্ম দিয়েছে, তা অস্বীকৃত হয়ে যায়। ফলে তথাকথিত কঠিন কংক্রিটনেস-ই হয়ে পড়ে সে বিচারে বাস্তব। ঝোঁক পড়ে নৃশংসতা, বলপ্রয়োগের দিকে, হিংস্রতার প্রতি—বলা হয় এগুলিই মানবিক সত্তার সারাৎসার। প্রেম হয়ে যায় পাশব প্রবৃত্তি। বলা হয় 'অসৎ হওয়াই মানবিক ধর্ম'। যেন এসব পদ্ধতিতে শক দেবার মধ্যেই আছে নিরাবরণ কংক্রিটনেস। আর এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে যে নৈর্ব্যক্তিকতা, তা সব সময়েই মানুষকে অ্যালিয়েনেশনে বন্দী অবস্থাতেই দেখতে বা দেখাতে চায়। মুখের ভাষার ছন্দ হয়ে যায় 'Shakespeherian Rag'—। কবি যেমন প্রয়োজন মনে করেন, তেমনি পথ চলতে বেছে নেন এটা সেটা। এলিঅট যেমন 'সেক্সপিয়র অ্যাণ্ড দ্য স্টোইসিজম অব সেনেকা' প্রবন্ধে বলেছেন—কবির কাজ

চিন্তা করা নয়, বরং যা ইতিমধ্যে তৈরি রয়েছে তেমনি সব চিন্তা যা তিনি পেয়ে যাচ্ছেন, সেগুলিকেই নিজের যোগ্য ভাষায় প্রকাশ করা।

এখানেই রয়েছে নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে বিপদ—এই পেয়ে যাবার ব্যাপারে। মানবতাবিধ্বংসী মূলধনতন্ত্রে পেয়ে যাওয়াটাই হলো অ-মানবিকতার একটা সামান্য লক্ষণ। আমরা পেয়ে যাই অনেক কিছু। পেয়ে যাই নানা গ্যাজেট, বিজ্ঞাপন-নিয়ন্ত্রিত হয়ে নানা জিনিস। তারপর সংবাদপত্রে পেয়ে যাই এক সময় প্রবল মারণাস্ত্র প্রয়োগ ভিয়েতনামে, বা অন্য কোনো স্থানে। আমাদের অংশগ্রহণ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না, বরং থাকে পেয়ে যাওয়া, কেবল আলটপকা পেয়ে যাওয়া। কবির মুখচ্ছদও তখন এলিঅট কথিত ঐ একলেকটিক ব্যাপার হয়ে পড়তে বাধ্য। মুখচ্ছদ আর কবির নিজের নয়—মূলধনতন্ত্রে ক্রমাগত পেয়ে যাওয়ার মধ্যে যে পার্টিসিপেশনহীন অনন্বয় আছে, তাও এতে প্রকট হতে বাধ্য। এবং সে বিচারে কবির মুখচ্ছদ গ্রহণ অনন্বয়েরই একটি বিশেষ প্রকাশ হয়ে যাবার বিষয় হয়ে যায়। আমরা বরং কৌতূহলী হয়ে দেখছি, সাম্প্রতিক কবিতায় এই তথাকথিত কবি ও তার কবি মুখচ্ছদের মধ্যেকার ফাঁক আবার ভরাট হয়ে যাচ্ছে। গেতো ইতিমধ্যেই নেরুদা, আরাগঁতে ভরাট হয়েই ছিল। ভরাট হয়ে গেছে আমাদের দেশেও সম্প্রতি বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাম বসু এবং অন্যান্য বহু অগ্রজ কবির মধ্যেও। এমনটি দেখা যাচ্ছে এমন কি মার্কিন দেশেও। মহাসোভিয়েতেতো ঢের দিন আগেই এ ফাঁক পুরণ হয়ে গেছে। ভরাট হয়ে যাবার একটাই কারণ—কবির কমিটমেণ্ট এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব মিশে গিয়ে অনন্য সত্তায় কবিকে পর্যবসিত করেছে বলে। এ ফাঁক পুরণের জন্য মানবিত জগৎ সম্পর্কে উপলব্ধি বোধ এবং সমাজকে বদলে দেবার আকাঙ্ক্ষা যে সক্রিয় হয়ে থাকে, এ কথা আজ অনেকখানি স্পষ্ট।

নৈর্ব্যক্তিকতার তাৎপর্যেও যে অ্যালিয়েনেশনকে উত্তীর্ণ করা যেতে

পারে, আমাদের দেশে ত্রিশের যুগের কবিদের মধ্যে সেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ কবিতা আপন স্বধর্মে উজ্জ্বল দেখেছি। চল্লিশে তার ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে। বরং কবিতা ফিরে এসেছিল কবির নিজস্বতায়। কবিকে আমরা চিনতে পারছিলাম। আমরা সুভাষ-সুকান্তকে তখন নতুন তাৎপর্যে চিনেছিলাম। কমিটমেণ্ট ছিল সে কবিতার পুনর্বাসনের মূল ভিত্তি। অবশ্য অগ্রজ কবিদের মধ্যে এর যথেষ্ট ইঙ্গিত ছিল। যেমন অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র বা সমর সেন। কিছু পরে দিনেশ দাসে। পঞ্চাশের যুগে, আধুনিকতার পাশাপাশি 'আধুনিকতা'র নামে না নির্ব্যক্তিক বা না কমিটেড অথচ ব্যক্তিপ্রাধান্যস্বীকৃত কবিতাও দেখা গেছে। দেখছি অনেকে তথাকথিত কংক্রিটনেস আনছেন বলে শপথ নিচ্ছেন। ফলে অতিসরলীকরণের তাগিদেও কবিতা রচিত হয়েছে। যে পাঠককুল আধুনিক কবিদের গ্রহণ করতে পারেন নি, তাঁদের পঞ্চাশ দশকের সন্ততিবৃন্দ এই সরলীকরণের কাব্য পড়ে চমৎকৃত হয়ে, আধুনিকতার ছদ্মবেশে তথাকথিত 'রবীন্দ্রানুসারী' কবিসমাজের শুদ্ধ সংস্করণকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

আপাত দুর্বোধ্যতা ও দুরূহতার বিরুদ্ধে এই ঝোঁক, অবশ্যই বাংলা আধুনিক কবিতাকে মূল্যায়নের যোগ্য পরিপ্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কবিতা পাঠকের নিকটে সহসা দুরূহ ঠেকলেও তা যে যথার্থ আধুনিক কবিতার গভীরতলের মূল্যে নিরূপিত হয় এ-আমরা এলিঅট, ইয়েটস্, পাউণ্ড, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশে দেখেছি। বাঙালির স্মৃতি সহজেই মুছে যায়। ফলে অগ্রজের নিষ্ঠা ভুলে আমরা আপন সহজিয়া খ্যাতির পৃষ্ঠপোষকতায় নেমে যাই।

তবে কি আমরা নৈর্ব্যক্তিকতার নামে একেবারে মুখাবরণের রঙে, অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকব? এর কি কোনো উত্তরণ নেই? যদি মেনেও নিই-যে কোনো এঞ্জিনিয়রকে তাঁর কাজকর্মের সময় তাঁর বৃত্তির ওভারহলই গায়ে পড়ে নিতে হয়েছে বলে সেই বৃত্তিগত টিপিক্যালিটিই

আমাদের একমাত্র আলোচ্য হবে, তখনও এমন কোনো অবস্থা আমরা ভাবতে পারি কিনা যখন কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের মধ্যেকার ফারাক আমরা দূর করে দেব! এমন কি তার ব্যক্তিগত টিপিক্যাল আচ্ছাদনের তলায় মানবিক সত্তাকে চিনতে পারব! যদি তেমন অবস্থাই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত হয় তাহলে অভিনেতার রং মাখা মুখে আমরা কবির নিজস্ব ব্যক্তিত্বকেও চিনে নিতে পারব।

"কবির কোনো 'ব্যক্তিত্ব' প্রকাশের নেই, বরং তাঁর আছে একটি বিশেষ মাধ্যম যা একটি মাধ্যমমাত্র, ব্যক্তিত্ব নয়—যার মধ্যে বিবিধ অনুভব এবং অভিজ্ঞতা অদ্ভুতভাবে ও অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মিলিত হয়ে যায়। মানুষের কাছে জরুরি যে সব অনুভব ও অভিজ্ঞতা থাকে কবিতায় তাদের স্থান নাও হতে পারে এবং যা কবিতার ক্ষেত্রে জরুরি সেগুলি মানুষের কাছে, তার ব্যক্তিত্বের কাছে যৎসামান্য ভূমিকাও নিতে পারে।" এমন কথা বলেছিলেন এলিঅট।—কিন্তু কবিতা একেবারে নিরঙ্কুশ স্পেশালাইজেশন তো নয়। কবিতার উৎসে রয়েছে অজস্র মানুষের অভিজ্ঞতার শিকড়! ব্যক্তি এ যুগে জগন্নাথের রথচক্রে পিষ্ট হয়ে যেতে যেতে নিরবয়ব ইতিহাস দেবতার সামনে ভূমিকাহীন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নয় কেবল, অন্যপক্ষে যুগের অন্তঃসার আত্মসাৎ করা এবং তা সক্রিয়ভাবে কাব্যভাত করার মধ্যেই আছে কবি-ব্যক্তিত্বের উৎসার। নৈর্ব্যক্তিকতার পরেও এসে যায় তাই ব্যক্তিত্বের নতুন আবিষ্কার, যার জন্যে কবি স্বকীয় অথচ ইউনিভার্সাল হয়ে ওঠেন। কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব উন্মাদনা থেকে উদ্ভূত কোনো প্রবণতার কাব্যগত প্রকাশ নয়, বরং অন্য কিছু—অর্থাৎ যা বিশ্বজগতে মানুষের স্থান আবিষ্কার করা এবং সেই আবিষ্কারের পথে উন্নততর স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু আধুনিক কবিতার আপাত দুর্বোধ্যতার তাৎপর্য বুঝতে এই পার্সোনা সঙ্কটটি আলোচনার প্রয়োজনেই এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনা।

কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে

ট্র্যাজেডির মৃত্যু হয়েছে—এমনধারা আলোচনা বা বক্তব্য আমাদের শতকের গোড়ার দিকে তো বটেই, গত শতকের শেষ অর্ধাংশ ধরে নানা সুরে বা স্বরে শোনা গেছে। কোনো কোনো সমালোচক এজন্যে দায়ী করেছেন উপন্যাসের উদ্ভবকে। বলেছেন, নভেলও ট্র্যাজিক আবেগকে ধরেছে। তবে ঢের তরল করে পরিবেশন করতে হয়েছে তা। যে আঙ্গিকের যে সীমাবদ্ধতা, তাতো মানতেই হবে। কেউতো দায়ী করেছেন 'ডেমোক্র্যাটিক পাবলিক' নামে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অতি পরিচিত নিরবয়ব সংখ্যাগুরুকে। সেই সংখ্যাগুরুর নাকি আছে ট্র্যাজেডির গঠন সম্পর্কে অনাসক্তি! তাদের যূথমনস্কতা ও কবিতা বোঝার ব্যাপারে গড়িমসি বা এক প্রকার আতঙ্ক—ট্র্যাজেডি, বড় করে বললে, কাব্যনাট্যেরও নাকি মৃত্যু ঘটিয়েছে।

সংস্কৃতি-নৃতাত্ত্বিকরা অবশ্য অন্য কারণ বাতলেছেন। তাঁরা বলবেন, পৌরাণিক যুগের ট্রাইবাল জীবনের হিংস্রতা এবং মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ও নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা—এই দুইয়ে মিলে একদিকে যেমন ছিল ট্র্যাজেডির বীজ, অন্যদিকে তেমনি জড়িয়ে ছিল যৌথ আবেগের এমন এক বিশেষ মুহূর্ত ও অসহায়তা যা উভয় মিলে ট্র্যাজেডি জন্ম দিয়েছিল, কবিতা ও নাটক একসূত্রে গেঁথে তুলে।

কিন্তু এ-সব মত যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের কাছে যেন সবকিছুই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা হয়ে গেছে। যেন এক বিশাল অর্থনীতি-চক্র ঘুরে চলেছে, যার চাকার মধ্যে চাকার আদি-অন্ত সব জানা

হয়ে গেছে। মানুষ ও প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ, মানুষ ও তার নিজগোষ্ঠি এবং ব্যক্তি ও তার ব্যক্তিসত্তার মধ্যেকার অনন্বয় যেন উত্তীর্ণ হওয়া গেছে। যাঁরা মনঃসমীক্ষা নিয়ে চর্চা করে থাকেন, তাঁরা অতি নির্দিষ্টভাবে বিচার করে দেখেছেন যে, বরং এমন ধারা নিরঙ্কুশ সবজান্তা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে আছে এক ধরনের নিয়তিবাদ বা ভাগ্যবাদই। লর্কা, ক্লদেল, এলিঅট, ‘ওনিল—এঁদের রচনায় কি আমাদের মধ্যে জীবনঘাতী জীবতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক অথবা বংশধারাগত শক্তিসমূহের বিহ্বলকর কার্যকলাপের স্বীকৃতি পাওয়া যায় না?

ইদিপাসের তুল্য নিরঙ্কুশ টাইরান্ট, জন্মসূত্রে যে রাজা নয়, বরং নানা গুণের আধার সেই টিরন্নস মেধা, ক্ষমতা ও অর্থের দাক্ষিণ্যে আজও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। ইদিপাস যেন খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জীবিত আধুনিক সভ্য মানুষের প্রতীক। সে তার পরিপার্শ্ব নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তার নিজ ভাগ্যের রচয়িতা হয়ে যেন সে ‘দেবতাদের সঙ্গে তুলনীয়’। কিন্তু সে দেবতা নয়। ইদিপাস তার তীর ছুঁড়েছেই অন্য সবাইকে ঢের ছাড়িয়ে আর পুরো সম্পদ আব সুখকে সে জয় করে নিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের যে ব্যক্তিসামর্থ্যের আপাত সার্থকতা, সেই মানুষ হয়ে পড়েছে সে। যে মানুষের কথা স্ফীংসের ধাঁধার উত্তরে নিজেই বলেছিল। যেন আন্তিগোনের সেই মানুষ, “অনেক অনেক আছে বিস্ময় আর শঙ্কার বিষয় কিন্তু মানুষের চেয়ে বিস্ময়কর আর ভয়ঙ্কর নেই কিছু।” ইদিপাসের যে সমস্যা অর্থাৎ ‘আমি কে’, তার উত্তরে প্রথমে সে থাকে ‘সব মানুষের একেবারে প্রথম’, শেষে সে হয়ে যায় ‘সব চেয়ে দীন!’ ‘আমিই শাসন করব’ হয়ে যায়, ‘আমি মেনে চলব বিনত হয়ে।’ আরিস্ততল একেই বলেছিলেন রিভার্সাল। আর এই রিভার্সালের পরেই থাকে সেই আস্বাদন, আত্মদানের মধ্য দিয়ে ট্র্যাজিক চরিত্রটি হয়ে ওঠে দেবতাদের সহযাত্রী। জুডিও-ক্রিশ্চানিটিতে যা হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত রেজারেকশন।

ট্র্যাজেডি নিয়ে এত সব বলার প্রয়োজন হলো কেন? ট্র্যাজেডির মধ্যেই আছে কাব্যনাট্যের বীজ। আর যে-যুগে, যে-সময়ে এ প্রশ্নটি উঠে এসেছে 'আমি কে', তার সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে দাঁড়িয়ে মানুষ সব কিছু জানবার মধ্যে যখন অনেকখানিই জানতে পারেনা, তার সেই সন্দীহান অস্তিত্বের চূড়ায় উঠে আসে ট্র্যাজেডি। এবং শিকারী হয়ে যায় শিকার, রক্ষাকারী হয়ে যায় রক্ষাপাওয়া বিষয় ('আমি রক্ষা পেয়েছিলাম কোনো ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের প্রয়োজনে') আর কবিতায় প্রকাশ পায় ট্র্যাজেডি যথাযোগ্যভাবে। কীটস কথিত সেই নিগেটিভ কেপেবিলিটির কথা এখানে মনে পড়ে যায়—অর্থাৎ নিশ্চয়তার মধ্যে না এসে অনিশ্চয়তার মধ্যে, রহস্যের মধ্যে, সন্দেহের মধ্যে—ঘটনা বা যুক্তির মহামহিম পারম্পর্যে ফিরে না যাওয়া। কবির মনের মধ্যে যে ছাপগুলি পড়েছে, তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেগুলি মিলিয়ে নিয়ে অ-পূর্ব ও অপ্রত্যাশিত পথে তিনি মাধ্যমটিকে প্রকাশ করছেন এবং 'কবিতা আবেগের শিকলছেঁড়া প্রবাহ নয়, বরং আবেগ থেকে তার মুক্তিই কবিতা। ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, বরং ব্যক্তিত্ব থেকেই মুক্তি।' আর এই কবিতাই নাটকে যৌথ প্রতীকগুলিকে বিশেষিত করে প্রকাশ করতে পারে এবং যৌথ আবেগকে উন্মোচন করে প্রয়োজনীয় পথে তাকে প্রবাহিত করে দেয়।

আজকের দিনে তবে কাব্যনাটকের মৃত্যু হবে কেন! এখন কি সভ্যতার সেই সময় নয়, যখন তুঙ্গ শীর্ষে উঠেছে মূলধনতন্ত্রী তথাকথিত ব্যক্তিস্বার্থবাদী মানুষের সমাজ, এমন-কি ব্যক্তি যেন নিরঙ্কুশতায় চূড়ান্ত। বিশেষভাবে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় একদিকে সাধারণ মানুষ যেন পরমাণুর মতো অদৃশ্য। অথচ সাফল্য বলতে কারো কাছে রাষ্ট্রশাসনে নিরঙ্কুশ আধিপত্যই লক্ষ্য। বিশ্বজগৎ, আর্থনীতিক জগৎ, সমাজজীবন সবই যেন তার কাছে কম্প্যুটারের হিসাবনিকাশ। জলেস্থলে তার সদা প্রতীক্ষ মারণাস্ত্র। এমনকি আর্থনীতিক ব্যবস্থা কখন যে ভেঙে পড়বে, কখন যেন

টালমাটাল হয়ে উঠবে সমস্ত নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র—তার ভয়ে সদাসংর্ক বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার ও পাম্প প্রাইমিং-এর চিন্তায় সদা জাগ্রত সে। এখানেই তো টিরনস শিকার হয়ে যায়। এমন-কি ছোটখাট সংগঠনেও সেই একই বৈপরীত্য। এখানেই নাটক। এখানেই ট্র্যাজেডি। এখানেই কবিতা। আর এই সন্দিহান অস্তিত্বের যোগ্য প্রকাশ নাটকে পদ্য বা গদ্য ছন্দে তো কবিতায় ব্যবহার করা যেতেই পারে।

তবু লোকসাধারণের ধারণা নাটকের ক্ষেত্রে পদ্য বাধা সৃষ্টি করে থাকে। তাদের মতে নাটকের আবেগের সীমা এবং বাস্তবধর্মী সত্যের সীমাবদ্ধতা এর ফলে নাকি আরও বেশি বাঁধা পড়ে যায়। অবশ্য একথা ঠিক, লোকসাধারণ একদা নাটকে পদ্যের ব্যবহারে খুশি ছিল। কারণ দর্শাতে শোনা যাবে, তখনকার শ্রোতা-দর্শক সীমাবদ্ধ ও কৃত্রিম আবেগের পরিমণ্ডল নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। আধুনিক নাট্যরসিকের মতে তাই কেবলমাত্র গদ্যই আধুনিক অনুভবগুলিকে মূলসুরে স্পন্দিত করতে পারে, বাস্তবে যা ঘটে তাকে ধরতে পারে। এলিঅট কিন্তু প্রচলিত জনপ্রিয় এবম্বিধ মতামতের উত্তরে বলেছিলেন যে প্রতিটি নাট্যধর্মী প্রকাশই তো কৃত্রিম প্রকাশন। কিন্তু আমরা বাস্তবতার নামে কেবলমাত্র তার আদল নিয়েই সন্তুষ্ট, মূলে আমরা যেতে চাই না। মানুষের একটি অংশ তার প্রজাতিভিত্তিক, বাকি চলতি সমাজগত অংশটি তার উৎপাদন. শ্রেণীসত্তা ও ইতিহাস ভিত্তিক। অথচ আমরা কী সন্দেহ প্রকাশ করব যে এসকিলাসের সময় থেকে আজের যুগের মানবিক বোধ ও অনুভবগুলির দারুণ একটা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে? কেবলমাত্র অঙ্গাবরণে ও বহিরঙ্গবিন্যাসে সময়ের ছাপ রয়েছে মানুষের আচরণে, কিন্তু মানুষ তার আপন স্বধর্ম নিয়ে আপনার গভীরে অনন্যমূল্যে নিহিত আছে, প্রোথিত রয়েছে। বরং সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার প্রয়োজনে কাব্যনাট্য ধারার

উপজাত হয়ে গদ্যনাটকের উদ্ভব ঘটেছে। এবং মানুষের গভীর কথা বলতে গেলেই আবেগ স্পন্দিত উচ্চারণে কবিতা স্ফূর্ত হয়ে ওঠে। তাই মানুষের গভীরতম অনুভব উচ্চারণের নাট্যভূমিকায় কবিতাই মূল উপকরণ, অথচ কাব্যনাটক বিষয়ে আমরা কতই না অনভিজ্ঞ ও কৌতূহলহীন!

নাটকের উদ্ভবের সঙ্গে কবিতার ও সঙ্গীতের যে গভীরতম সম্বন্ধ আছে তা আজ পুরাতত্ত্ববিদ, নৃতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসুদের গবেষণার সাফল্যের ফলে জানা গেছে। মানুষের সমগ্রপ্রকার লিখিত শিল্পের মধ্যে কবিতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রচলিত শব্দকে উচ্চগ্রামে ছন্দ ও বিন্যাসে বাঁধবার দাক্ষিণ্যে যে আদিম কবিতা রচিত হয়েছিল, তার সঙ্গে সুরের সংযোজন ও অঙ্গসঞ্চালন, একই কর্ম-সাপেক্ষ পরিপূরক অর্থে বিধৃত ছিল। এমন কি পেরিক্লিসের এথেন্সের আত্মসচেতন সাহিত্যকর্ম নাটকে কবিতা ও সঙ্গীতের আপাত অর্থে তফাতও লক্ষ্য করা যায় না। বরং অভিনীত হলেও তা ছিল গেয়। এমন-কি গ্রীক নাটকের ঢের পরে অনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্ভূত প্রাচীন ভারতে নাটককে নাট্যশাস্ত্র আনুযায়ী চক্ষু-কর্ণের আনন্দ বিধায়ক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পঞ্চম বেদ বা নাট্যসাহিত্য নাকি ঋক বেদ থেকে বাণী, সামবেদ থেকে গীতি, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে অনুভূতি ও রস গ্রহণ করে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন বলে পুরাণ কাহিনীতে বলা হয়েছে। আ-শূদ্র চতুর্বর্ণের জন্য সৃষ্ট পঞ্চম বেদ, এই নাটক, অনেকখানি ডেমোক্রাটিক স্পিরিটের ইঙ্গিতও দেয়।

প্রতিটি আঙ্গিকের গ্রীক কবিতাতেই প্রয়োজনীয় সুরধর্মী উচ্চারণ পদ্ধতি, এবং যন্ত্রাদি সহযোগে সুরযোগ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। এমন কি স্বয়ং হোরেস তাঁর আর্স পোয়েটিকাতে লাতিনেও ছন্দ, মাত্রা ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে মনস্ক হবার উপদেশ দিয়েছিলেন। গ্রীক নাটকের

আগেও যদি প্রাচীন কোনো নাটকের কথা ভাবি, তা ছিল নিশ্চয়ই পুরোপুরি কৃত্য বা রিচুয়াল-ভিত্তিক যৌথ ব্যাপার। কিন্তু প্রাচীন নাট্যধর্মীকাব্য এবং কাব্যসমৃদ্ধ নাটকে কবিতার গুণ বা নাটকের গুণ তো পুরোপুরি ছিলনা, আদিম মানুষের ইচ্ছাপুরণের দিকটাই অভিনয়-সাপেক্ষ সুরযুক্ত পদবিন্যাসে, এবং সুরযুক্ত পদ-সাপেক্ষ অভিনয়ে হস্তপদ সঞ্চালনগত ছন্দের প্রকাশে আদিম শিল্প-আঙ্গিকে বিধৃত ছিল। কিন্তু সে অভিনয় কলায় ব্যক্তিমানুষের কোনও মূল্য ছিলনা, বরং গোষ্ঠিজীবনের স্মৃতিই শিল্পের উপজীব্য হয়ে উঠেছিল।

কাব্যনাটক আমাদের এমন বহু ঘুমন্ত অনুভব জাগিয়ে তোলে, যার ফলে মানবপ্রজাতির অনন্বয়ের বহু গভীর বিষয় উন্মোচন করে দেয়। য়ুং এমন কিছু কবিতার কথা বলেছিলেন, যা পাঠকের মন মন্থন করে দেয় দারুনভাবে। পাঠকের সচেতনতা ও সচেতন প্রতিক্রিয়ার তলায় এমন অ-সচেতন জগতকে তা নাড়িয়ে দেয় যাকে আদিম ইমেজ বা আর্কিটাইপ বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। যা একই টাইপের অসংখ্য অভিজ্ঞতার মানস-পরিশিষ্ট, সাইকিক রেসিডিউ। যেন বহু অভিজ্ঞতা একই ভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় ঘটে চলেছে, পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর পুরুষের দিকে অন্তঃশীলা প্রবাহ হয়ে নির্জনে বহে আসছে, যেন মস্তিস্কের মধ্যেই গড়ে তুলেছে এক বিশেষ ছাপ। ফলে হয়ে উঠেছে 'ব্যক্তির অভিজ্ঞতা নিয়ামক' কিছু প্রতীক যা পূর্ব থেকেই রয়ে গেছে a priori হয়ে।

গিলবার্ট মারে হ্যামলেট ও ওরেস্টেস্-এর মধ্যে এক আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করেছিলেন, যেন তা 'প্রায় চিরায়তভাবে স্থায়ী'। এ-সব ঘটনা 'কোনো জাতিগোষ্ঠির স্মৃতির মধ্যে গভীরভাবে উপ্ত হয়ে থাকে, শারীরিক সংগঠনে যেমন জাতি-চিহ্ন প্রোথিত হয়ে থাকে,' ঠিক তেমনি ভাবে তা পরিষ্কার চিনতে পারা যায়। এমন থীম "আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে সেগুলি, তাদের দেখা পেলেই লাফিয়ে ওঠে, রক্তের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে, চিরকাল

ওদের সঙ্গে আমাদের চেনাজানা আছে ঘোষণা করে। ···হ্যামলেট, আগামেমনন বা ইলেকট্রার মতো নাটকে আমরা নিশ্চয়ই সূক্ষ্ম ও নমণীয় চরিত্র অনুধাবন পেয়ে যাই, পাই নানা মাপের সুবিন্যস্ত কাহিনী এবং কবি ও নাট্যকারের তাদের শৈলীগত উপকরণের উপরে পূর্ণ অধিকার। কিন্তু আমার মনে হয়, এক অভূতপূর্ব, আচ্ছাদনের ঠিক তলায় রয়েছে এক অ-ব্যাখ্যাত কম্পন, এক কামনা আর ভয় আর আবেগের চোরাস্রোত। দীর্ঘকাল ধরে তা নিদ্রিত থাকে। তবু তা আমাদের অতিচেনা। যারা আমাদের অতি নিজস্ব আবেগের খুব কাছে শিকড় চালিয়েছে, বুনোট করেছে আমাদের অধিকাংশ যাদুকরী স্বপ্ন। কত যুগ আগে এই স্রোতোধারা উৎসে পৌছবে, আমি কল্পনাও করতে পারি না, কিন্তু আমার মনে হয় এই নদীকে মন্থন করে দেওয়ার ক্ষমতা বা তার প্রবাহের সঙ্গে বহে যাওয়া মহাপ্রতিভাধরের শেষ গোপন বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম।"

আবশ্যিকভাবে তাহলে শ্রেষ্ঠ নাটকে রয়েছে অতীতের ঘুমন্ত স্বপ্ন। এমন কী মীথ। এমন-কি মীথের তলায় যথার্থ অর্থবহ অ্যালেগরি। যেমন অর্ফিয়ুস-ইউরিডাইস-এর মহাকথা। রিলকে অবশ্য তাকে অন্য তাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন। ধ্রুপদী গ্রীসে আফয়ুস-ধর্মে বিশ্বাসীরা অর্ফিয়ুসের সঙ্গীতকে ধরতেন উন্নততর বোধি এবং আত্মার মুক্তির প্রতীক হিসাবে। ইউরিডাইস ছিল মানুষের আগ্রাসী শক্তি যা মৃত্যু ও অকল্যাণের প্রতীক। অর্ফিয়ুসের উপরে নির্যাতন, তাঁদের কাছে ছিল মাটির উপরে ও মৃত্যুর রাজ্যে উন্নত আত্মাব অনুন্নত আত্মাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবার প্রতীক। এমন-কি এ কাহিনীর অন্তঃসার ভার্জিল-এর এনীডে পাওয়া যাবে। কার্থেজ-এর বিধবা রানি ডিডোর সঙ্গে প্রেমোন্মাদনার ছাপ, এমন-কি তার দুই সহযাত্রী পালিনুরাস ও মিসেনাস-এর মৃত্যুর ছাপ স্মৃতিতে বয়ে ঈনিয়াস এলেন ইতালিতে। কিন্তু 'স্বগায় রাজ্য' রোম গড়ে

তুলতে তাকে এই ছাপগুলি থেকে বিশুদ্ধ হয়ে মুক্ত হতে হবে। এজন্য তাঁকে হেডসে একবার যেতেই হবে। আসলে নরকে নামাতো প্রতীক মাত্র। মনের গভীর অন্ধকারে আত্মপরীক্ষায় অবগাহন করতে হবে। যে পরীক্ষায় অগ্নিশুদ্ধ হলে তবেই আসে যথার্থ সৃষ্টির অধিকার। "অ্যাভারনাস-এ অবতরণ অনেক সহজ, রাত্রিদিন কালো দিস-এর দরজা উন্মুক্তই আছে। কিন্তু ফিরে যাবার পথে এবং উপরে হাওয়ায় ফিরে আসা—এইতো যথার্থ কাজ এইতো যথার্থ কঠিন উত্তরণ।" (৬, ১২৬-৯)।

মহাভারতেও আছে এমনি নরক-দর্শন। এমন-কি রামায়ণেও। বেদনাকে উত্তীর্ণ হতে না পারলে উত্তরণ নেই। যেন রেসারেকশান।

গ্রীক নাটক বা তাদের মীথ ও অ্যালেগরিগুলি এখনও আমাদের নাড়া দেয় কেন? কেবলমাত্র তার শিল্প মহিমায়? নাকি গিলবার্ট মারে যেমন বলছেন, আমাদের বহু অকৃতার্থ সাধ ও বাসনা ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে, হাজার বছরের স্মৃতি-পরম্পরার মধ্যে ঘুমিয়ে থেকে হঠাৎ জেগে উঠে। এখানেই বাস্তবতার নাটক থেকে কাব্যনাটকের তফাত। কবিতা যেমন করে মনের মধ্যে স্মৃতিগুলিকে নাড়িয়ে দিয়ে দুর্মর আবেগ সৃষ্টি করে বিশ্বকে এক মুহূর্তে অন্ধকারে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো দেখিয়ে দেয়, দৃশ্যকাব্য হয়েও, কাব্য-নাট্যও ঠিক তেমনি কাজ করে। করে চলে। নাট্যমুহূর্তে আমরা মানব প্রজাতির আবহমানতায় প্রবেশ করে ভেসে যাই, এবং মনুষ্যত্বের অন্তঃসারের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। এজন্য আধুনিকতার তাৎপর্যে প্রতীকের পুনর্জাগরণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

গ্রীস দেশে উদ্ভিদ জন্মের মূলাধারেই নাট্যকলার জন্ম, ডাইনোসাস্ উপকথার মধ্যে জীবনের উত্থানের কাহিনী ছিল। তাই একদা ট্র্যাজেডি গঠনে সহায়তা করেছে। আপাতদৃষ্টিতে অনুল্লেখ্য ছাগসঙ্গীত পরবর্তী কালে অভিনয়ের জন্য পুরাকাহিনীভিত্তিক নাটক রচনা

করিয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি তাতে স্বর, মাত্রা সহ সঙ্গীতের আধিপত্য মানতেই হতো। কিন্তু ব্যক্তির শিল্পমুক্তিও তাতে এবার লক্ষ্যণীয় হলো।

পেরিক্লিসের এথেন্সে সেই নাট্যকলার সুবর্ণ যুগ এসেছিল। সালামিসের যুদ্ধে যোদ্ধসাজে যোগ দিয়েছিলেন, শোনা যায়, এসকিলাস। সে যুদ্ধের বিজয়োৎসবে নেতৃত্ব করেছিলেন মনোহরকান্তি সোফোক্লিস, এবং সে বছরই জন্ম নিলেন য়ুরিপিদিস। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাত্রয়ের আকস্মিকতাই লক্ষ্যণীয়। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন পারসিক আক্রমণের মুখে বিজয়ী অথচ অজস্র উপজাতিতে বিভক্ত গ্রীসে এবং বিশেষভাবে এথেন্সে মানুষের মূল্যবোধের বিচার হয়ে চলেছিল সবার অলক্ষ্যে। একদিকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে 'হলুদ ধাতু' স্বর্ণ, গোটা সমাজজীবন ব্যক্তির নিরঙ্কুশ আধিপত্যে এবং দাস প্রথাভিত্তিক পণ্যবিস্তারে টেনশান-ময়; অন্যদিকে, 'ইনস্ট্রুমেণ্টাল ভোকেল' দাসের অস্তিত্বের নৈতিকতা এবং ব্যক্তির উচ্চাশা সম্পর্কেই ঘনিয়ে তুলেছে প্রশ্ন। সংঘর্ষের সূচীমুখে ব্যক্তিত্বের বিস্ফোরণ দেখা গেল, মনে হলো অদৃশ্য হাতের টানে যেন উত্থান,—পতনের অবশ্যম্ভাবিতায় বহে চলেছে; মানুষের ভাগ্য টেনে রেখেছে নেমেসিস, আর পতনের মুখে ফিউরিরা মানুষটিকে বিদীর্ণ করে দেয়। অথচ মানুষকে লড়তেই হবে, যুদ্ধ করতেই হবে, মানুষের ললাটে রয়েছে সেই পতনের অদৃশ্য দাগ, যার ইঙ্গিতে ধ্বস্ত হতেই হবে। পুরাকাহিনী থেকে, বেশির ভাগ হোমারের ট্রয়যুদ্ধের কাহিনীকে ভিত্তি করেই ট্রয়ের বিশাল পতনের পরের (কিংবা অব্যবহিত পূর্বের) কোনও ঘটনাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান বলে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য প্রমিথ্যুস, হিপোলিটাস, ইদিপাস প্রভৃতি অন্যান্য ট্র্যাজিক চরিত্রগুলিও ছিল। আর ঐ ট্র্যাজিক বোধের উপরে ভিত্তি করেই এসেছে কাব্যনাট্য।

বলাবাহুল্য, মনে রাখা দরকার প্রথাসিদ্ধ জীবনচর্চায় যেখানে ক্লান্তি নেই, বৈচিত্র্যহীন স্থাবর চিন্তায় যেখানে বিরক্তি নেই, সেখানে মানুষের

মুক্তিও যেমন নেই,—মানুষই মানুষের মান প্রস্তাবক প্রোটাগোরাসকেও সেখানে পাবনা। মানুষ, কেবলমাত্র মানুষের ভাগ্য নিয়ে ট্র্যাজেডিও সেখানে জন্মায় না। অর্থাৎ মানুষের প্রজাতিভিত্তিক মানবতাবোধ যা যৌথ আচরণে এবং শ্রমভিত্তিক অন্তঃসারের সঙ্গে সম্পর্কিত—তাকে যখন ঢেকে ফেলে প্রবল ব্যক্তিস্বার্থ ও পরশ্রমজীবী অস্তিত্ব, তখনই সমাজ জীবনের গতিভঙ্গ বিষয়ে অজ্ঞান মানুষের কাছে ত্রস্ত অধঃপতন ছাড়া কোনো অর্থই যেন অবশিষ্ট থাকে না। তাই এনে দেয় ট্র্যাজিক বোধ।

কাব্যনাট্য যৌথ অন্বয়ের প্রতিমনস্ক হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তি-মানুষের বিজয়ের ও মুক্তির শিল্প-আঙ্গিক। এবং বাস্তব দৃশ্যধর্মিতার পরোক্ষে বিশিষ্ট আবেগবিধৃত অন্তঃশীলা মূল বিষয় কাব্যনাট্যে দেখা যায়। আর তাই গ্রীক আদর্শের মতো বিশিষ্ট ঐক্যের কথা বলতে এলিঅট বলেছিলেন, "শব্দ-সমূহের নাটকের পেছনে আছে ক্রিয়ার নাটক, উচ্চারণের ঢং, উত্থিত হাত অথবা জীবন্ত পেশি, এবং একটি বিশেষ আবেগ। মুখে শোনা নাটকে, যে শব্দগুলি আমরা পড়ছি সেগুলি প্রতীকমাত্র, একটি এক ধরনের সর্টহ্যাণ্ড প্রায়···অভিনীত এবং অনুভবকৃত নাটক যা সব সময়েই আসল একটা কিছু, তার তুলনায় বস্তুত তা খুবই সংক্ষেপিত সর্টহ্যাণ্ড।"

সুতরাং নাট্যকবিতা, কাব্যনাটক ও গদ্যনাটকে তফাৎ দেখা যাবে। কাব্যনাটকে একধরনের দ্বিচারিত্র লক্ষ্যণীয়। যেন দুটি তলে (plane) একযোগে ঘটে চলেছে। বাইরে রয়েছে ইতিহাস, শ্রেণীভিত্তিক মানুষ, তার আচরণ ইত্যাদি ; অন্তঃপ্রবাহে রয়েছে মানব-প্রজাতির মহৎ অন্তঃসার। টেম্পোরাল মুখচ্ছদ দিয়ে টাইমলেসনেসকে আয়ত্তে আনার আঙ্গিকই কাব্যনাট্য। মানবিক অন্তঃসার এবং ঐতিহাসিক স্তরভিত্তিক সামাজিক অন্তঃসারের ডায়ালেকটিক্ সম্পর্ককে মানবিক অন্তঃসারের মহৎ সত্যের দিকে প্রবাহিত করে দেয় কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্যের প্রধান উপকরণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ট্র্যাজিক হতেই বাধ্য। কেননা শ্রেণীবিভাজন,

সমাজকে মানবিক অন্তঃসার থেকে সুদূর করে তোলে, শ্রেণীবিভাজনের তাৎপর্যেই আছে ট্র্যাজেডি। সুতরাং উপস্থাপিত ট্র্যাজিক সত্যটি বহিরঙ্গে না ঘটালে অন্তরঙ্গে মানবিক অন্তঃসারকে উন্মোচন ঘটানো যায় না।

মেটারলিঙ্কের প্রতীকী নাটকে, অথবা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'-এর মতো নাটকে যেন মনে হয় সচেতন পরিকল্পনাশ্রয়ী মন কাজ করছে। আপাতদৃষ্টিতেও যেন অতিরিক্ত একটি তলের মতো কিছু আছে বলে চোখে পড়েনা। অথচ কাব্যনাটকে আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়বে অপ্রয়োজনীয় কিছু অংশ, কিন্তু কাব্যনাট্যের তাই দ্বিচারিত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে। নাটকটির একটি নিহিত নক্সা রয়েছে, বাইরের মঞ্চের ঘটনাময় অবয়ব এবং কুশীলব থেকে যা অনেকখানি ঢাকা, গোপন, কবিকণ্ঠের ব্যঞ্জনায়। আর সেই কণ্ঠস্বরের গভীরতায় মানুষের জীবনের গভীরতম সত্যের কথা বলতে হবে। তাই কাব্যনাটকে তিনটি মুখ মনে পড়ে। অভিনেতা অঙ্গ-সঞ্চালনে শব্দকে অর্থপ্রদান করছে ঘটনার অনুষঙ্গে ; শ্রোতা ও দর্শক সেই ঘটনা ও অভিনয়ের অনুবর্তনে অনুধাবনে নিযুক্ত ; তৃতীয় কণ্ঠস্বর এলো কবির—। নাটক হতে গেলে তো কেবলমাত্র কবিতা হলে চলবে না, নাটকও হতে হবে, আর সেই নাটকীয়তার অন্তরালে, মানব-জীবনের গভীর উপলব্ধির অন্তঃপুরের কথা কবি নিমগ্ন সুরে শোনাবেন। কাব্যনাটক রচনার অতি জটিল দিক এইভাবেই উন্মোচিত হয়। এই জটিলতার মধ্যেই কবির সিদ্ধি, কেননা উপযুক্ত ট্র্যাজিক অনুভবের কাব্যায়ণই কবিকে আত্মপ্রকাশের স্বরূপ দেখাবে, নতুবা হোরেস যেমন আর্স পোয়েটিকায় বলেছিলেন থেসপিস ও এসকিলাসের পরে আসে প্রাচীন কমেডি—অবশ্য কম উল্লেখযোগ্য তা নয়। 'কিন্তু এর ব্যক্তিস্বাধীনতা এমন বেপরোয়া অশ্লীলতায় এবং উৎপাতে গিয়ে পৌঁছায় যে, আইন করে তাকে বন্ধ করতে হয়...।' আমাদের দেশেও কাব্যনাট্যের নাম করে জ্যেষ্ঠ কবিও, ট্র্যাজিক বোধকে ধরতে না পেরে নেমে যান অনেক সময় যৌনতার অভিসারে।

বের্টোল্ড ব্রেখট-এর এপিক থিয়েটারের কল্পনার মধ্যেও রয়েছে দর্শকেদের নিজস্ব ভূমিকা। যেন তারা নাটকই দেখছে, অংশগ্রহণ করছে না, কিন্তু অংশগ্রহণ ঘটে যাচ্ছে তাদের মনোজগতে ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

টিউডর ইংলণ্ডেও ব্যক্তিত্বের মুক্তির স্বাদ পাওয়া গিয়েছিল। প্রোটাগোরাস যেমন গ্রীসদেশে সফিষ্টদের সূত্রপাত করেছিলেন, কনষ্ট্যান্টিনোপল পতনের পর নবজাগৃতির ঢেউ ইংলণ্ডের তটে যখন ভেঙে পড়ল, মানুষ, কেবলমাত্র মানুষের বিষয়ে চিন্তাই তেমনি মর্যাদা নিয়ে ধরা দিল। মহাজ্ঞানী বেকনের চিন্তায় তার বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। ক্রমদূরপ্রসারণশীল ভূগোলের সীমানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনার বিশালতায়, আপনার সামান্যতায় ধরা পড়ল। এলেন মার্লো, শেক্সপিয়র। এবং আবার পণ্য-অর্থনীতি, আবার সেই সোনার শনি মার্কেন্টাইল সাফল্যের বাহন হয়ে এল। তুমুল উৎসারের ভেতরে যেন ধরা পড়েছে সেই আর্কিটাইপ কিছু কিছু—যাদের গ্রীক্ নাটকে দেখেছিলাম। গিলবার্ট মারে বলছেন ওরেস্টিসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে হ্যামলেটেরও মধ্যে।

হ্যামলেটকে আজকেও আমরা কলকাতার রাজপথে, এ্যাজাক্সকে আত্মঘাতী অতিবাম রাজনীতিতে, প্রমিথিউসকে বোধ হয় বেলসেন-অসোভিৎস-এর স্মৃতিস্তম্ভে খুঁজে পাব। মুক্তি না এসে, সংঘাত তীব্র না হলে—আত্ম-অনুভবের দরজা খোলা যায় না। তাই বোধ হয় আজকের অস্তিত্ববাদীরা বিক্ষোভের তীব্র অগ্নিচূড়ায় অস্তিত্বকে অবলোকন করতে চান।

কাব্যনাট্য রচয়িতা টমাস স্টার্ণস এলিঅট ১৯৫৯-এর ২১ নম্বর পারী রিভিয়ুতে এক সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড হলকে বলেছিলেন যে সব সময় তিনি গ্রীকনাটককেই আদর্শ ধরে থাকেন। "অবশ্য আমি কাব্যনাট্য বিষয়ে আমার নিজের তত্ত্বের প্রতি খুব একটা আর আগ্রহী নই……থিয়েটারের জন্য নাটক লিখতে বেশি সময় দিতে

গিয়ে তত্ত্ববিষয়ে কম সময়ই আমি দিয়ে থাকি।" এবং কবিতা রচনা ও কাব্যনাটক রচনার তফাৎ বোঝাতে গিয়ে এলিঅট বলেছিলেন ঃ

"আমার ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা লক্ষ্য থাকে এ-দুটি বিষয়ে। দর্শকদের জন্য রচিত হয় নাটক। আর কবিতা প্রাথমিক অর্থে কবি নিজের জন্যই রচনা করেন। অবশ্য অন্য কাউকে যদি কবিতাটি পরে কিছু না বোঝায়, কবি তাতে খুশি হবেন না। তফাৎ এদের মধ্যে এখানেই। কবিতাটির ব্যাপারে কবি বলতে পারেন 'আমার নিজের অনুভবগুলি নিজের জন্যেই শব্দে গ্রথিত করেছি।' 'আমার নিজের অনুভূতির শব্দের মধ্যে সমমানতা পাওয়া গেছে'। উপরন্তু, কবি কবিতায় তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরকেও বেঁধে রাখছেন। কবি আপন কণ্ঠস্বরের সাপেক্ষতায় চিন্তা করে থাকেন। অন্যপক্ষে নাটক লেখার সময় একেবারে প্রথম থেকেই লেখককে বুঝতে হবে যে তিনি এমন কিছু তৈরি করছেন যা অন্য লোকের হাতে চলে যাবে—রচনা করার সময় যে মানুষটি সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। অবশ্য আমি বলিনা যে নাটকের মধ্যে এমন সময় আসবেনা যখন এ দুই আবেদনই একসঙ্গে মিলে যাবে না। বরং আদর্শমূলক চিন্তায় তাদের সম্মিলনই আমি আকাঙ্ক্ষা করে থাকি। শেক্সপিয়রে প্রায়শই তা ঘটেছে। অর্থাৎ কবি যখন কবিতা লিখেছেন এবং নাট্যসাপেক্ষতায় চিন্তা করেছেন, একই সঙ্গে ভেবেছেন থিয়েটার, অভিনেতাবৃন্দ ও দর্শকদের কথা।"

সুতরাং এলিঅটের মতে কাব্যনাটকের আদর্শ মুহূর্ত পাওয়া গেল। কাব্যনাট্য সার্থক হয়ে ওঠে তখনই যখন নাটক ও কবিতা দ্বৈতরূপ থেকে অদ্বৈত হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত আলোচনার আলোকে বাংলা কাব্য নাটকের মূল্যায়ন করা যেতে পারে অনেকখানি।

বাংলাদেশে কাব্যনাটক লেখার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়, এমন কি ভারতেও। শোনা যায় গ্রীকরা গান্ধার অধিকার করার বেশ পরে গ্রীক প্রভাবে সৃষ্ট নাটক প্রথম ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভরতের সংগঠিত নাট্যপরিকল্পনার ঐতিহ্য কি তা সমাজতত্ত্বানুসন্ধানী বিদ্বান গবেষকদের আলোচ্য, কিন্তু এদেশে ট্র্যাজেডির অনুপস্থিতি আশ্চর্যভাবে লক্ষ্যণীয়। মহাকাব্যের ট্র্যাজিক চরিত্রগুলিও নাটকে যথাযোগ্য স্থান পায়নি। এর কারণ হিসাবে, সু-স্থির প্রায় উদ্ভিদানুগ জীবনচর্চা দায়ী হতে পারে, অথবা সাধারণ্যের ভাষার বাইরে সুসংস্কৃত রাজকীয় পরিবেশও কারণ হতে পারে। কেননা, সংস্কৃত নাটকের দর্শকসমাজ নিশ্চয়ই, আজ যাকে রাজনৈতিক নেতারা 'জনগণ' বলে থাকেন, তেমনি কিছু ছিল না। ফলতঃ নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণকুলজাত এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে রাজপুরুষের আধিক্য এবং নায়ক চরিত্রে রাজার আধিপত্য লক্ষ্যণীয়। উল্লিখিত দ্রুতমন্তব্য আলোচনা ও সমালোচনাসাপেক্ষ যদিও, হয়তো হঠকারীও, তথাপি ভারতীয় নাট্যধারায় কবির তৃতীয় কণ্ঠ বহু ক্ষেত্রেই প্রচলিত সংস্কারমুখী ধারণা ব্যতীত অনুপস্থিত। অথচ আমাদের দেশের প্রাচীন নন্দনশাস্ত্রকারের মতে নাটকও দৃশ্যকাব্য।

ভারতীয় জীবনধারার মধ্যেই অনুপস্থিত ছিল টেনসন। গ্রামসমাজ ও বর্ণাশ্রমধর্মের সু-স্থির জীবনচর্চা, পৌনঃপুনিক ভাবে একই জীবনপদ্ধতি যখন হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত থাকে, এমন-কি বর্ণবিভাজন যখন প্রশ্নের কারণ হয়ে ওঠেনা—তখন মানুষ ক্রমশ মানুষের শ্রমভিত্তিক মানবিক সত্তা থেকেই সুদূর হয়ে পড়ে। গ্রীক দেশে দাসপ্রথার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের তাৎপর্য ছিল। যুদ্ধে পরাজিত মানুষ, দাস পিতামাতার সন্তান অথবা ঋণের দায়ে আত্মবিক্রিত দাস,—উৎপাদনের সামাজিক পদ্ধতির ভিত্তি হিসাবে পর্যবসিত হয়েছিল সে দেশে। কিন্তু ভারতের সেচব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত গ্রাম-সমাজে দাস-প্রথাহীন বর্ণাশ্রম, মানুষকে সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত রেখেছে। কখনো কখনো এ প্রথা বিষয়ে প্রশ্ন উঠলেও তা শেষ পর্যন্ত বর্ণাশ্রমের পাঁকেই পথ হারিয়েছে। আমাদের লোকসাহিত্যে, কখনও ব্যক্তির বেদনা মূর্ত হয়েছে, যেমন 'চাঁদ সদাগর' চরিত্রটি, কিন্তু

তার পরিণতিও হৃত সম্পদের প্রত্যর্পণে সুস্থির। মানুষের ইচ্ছাপূরণে মানবিক ব্যক্তি-চরিত্রের গৌরবে আত্মধ্বংসও চোখে পড়ে না। নাটকেও চারিত্র্যসৃষ্টিতে উদ্ভিদানুগ জীবনচর্চার ছাপ বড় বেশি দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়ায়, আর তাই দীর্ঘকাল হয়ে ছিল আমাদের দেশের সনাতন জীবনাদর্শও।

আমাদের লোকজীবনে যে কবিতায় নাট্যধর্মিতা ছিল না, তা নয়। লোকগীতিকা কথকের মুখে নাটকীয়তার স্বাদ এনেছে। সমাজ অনুশাসনের ফলে ব্যক্তিগত প্রেমের জগতে যে বেদনা জন্ম নেয়, মৃত্যুতে তার পরিসমাপণের মধ্যে ট্র্যাজেডির বীজ কিছুটা প্রোথিত ছিল কোনো কোনো কাহিনীকাব্যে। কিন্তু কাহিনীর অন্তরালে উপস্থিত ছিলনা কোনো নিহিত অ্যালেগরি বা মীথ যার মধ্যে মানবিক অন্তঃসার পাওয়া যেতে পারে। এ কাহিনীগুলি মুখ্যতই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির রোমান্টিক-বেদনাবহ সংঘর্ষ মাত্র। এই রোমান্টিকতা কাব্যনাট্য গড়ে ওঠায় প্রশ্রয় দিতে পারে না। মঞ্চে অভিনয় করবার মতো কাব্যনাটক তাদের নিয়ে তৈরিও হয়নি। হবার কথাও নয়। বরং কিছু নাট্যকাব্য তৈরি হতে পারত যা কুশীলবের মুখে কবির নিজস্ব উচ্চারণ মাত্র। যা তাঁর কেবলমাত্র সামাজিক অস্তিত্বেরই মূল্যায়ন। বরং বাংলাভাষার সাহিত্যকর্মে কাব্যনাট্যগুণের প্রকাশ ঊনবিংশ শতকে প্রথম লক্ষ্য করা গেল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এ উক্তি-প্রত্যুক্তির ভূমিকায় চরিত্রগুলির হাইটেনড স্পীচ লক্ষ্য করার মতো। কাব্যের অন্তরালে ছিল যেন কিছু আর্কিটাইপ। সম্প্রতি বঙ্গদেশে কোনও নাট্যসংস্থা 'মেঘনাদ বধ কাব্য'কে নাট্যায়িত করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এতে মেঘনাদ বধের চরিত্রসমূহের কাব্যনাট্যধর্মিতা বাস্তব অর্থে স্মরণ করা যেতে পারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিকটে ব্যক্তি-চরিত্রের বিজয়-কীর্তন পরম ধ্বংসের আগুনে দগ্ধ হয়েও সম্ভবপর ছিল, কেননা তিনি বঙ্গদেশের খণ্ডিত হলেও ঊনবিংশ শতকের এনলাইটেনমেন্টের অন্যতম প্রধান পুরোহিত ছিলেন। প্রোটাগোরাস, এসকিলাস, সোফোক্লসের সমসাময়িকতা;

বেকন, মার্লো, শেকসপিয়রের সমকালীনতা ; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির সমযুগীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। খাড়াই সমাজের প্রস্তাবনায় ব্যক্তিমানুষ সামাজিক ভূ-সমান্তর জীবনচর্চার বাইরে স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের জগতে তখন বিদ্রোহী। মানুষের উত্তুঙ্গ-চূড় সাফল্যের পটভূমিতে পতনের সম্মুখীন সেই ব্যক্তিমানুষের প্রতিনিধি রাবণ বা মেঘনাদ। যেন বৃদ্ধ প্রায়াম ও হেক্টর। যেন কোনো পরিচিত আর্কিটাইপ যা আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে কালোত্তর কোনো বোধ, সেই জাগরণ মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্নগুলি মুখর করে তোলে !

উনিশ শতকের জাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব রবীন্দ্রনাথে এসে পৌছেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ রোমান্টিক লিরিক-কবি বলে চরিত্রের গভীরতম সত্য, যা ক্লাসিক নির্ভর সম্পূর্ণতার বা টোটালিটির বিষয়—তাকে প্রকাশ করা তাঁর কাজের আওতায় থাকেনি। 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ' 'বিদায় অভিশাপ' প্রভৃতি আবৃত্তি-সাপেক্ষ কাব্যমাত্র, এবং 'বিসর্জন' প্রভৃতি অভিনয় সাপেক্ষ ঘটনাবলীর ছন্দবদ্ধ রূপায়ণ। কিন্তু কাব্যনাট্যের যে গুণ, তৃতীয় কণ্ঠের উচ্চারণ, যা মানবিক কোনো মহৎ অনুভবের সঙ্গে সম্পর্কিত, (যা কেবলমাত্র স্নেহ বা পশুপ্রীতিতে, রাজতন্ত্র-পুরোহিততন্ত্র ইত্যাদির দ্বৈরথে অন্তঃগ্রথিত নয়) তার অস্তিত্ব সব সময় স্পষ্ট নয়। মূলতঃ 'ডাকঘর' বা 'রক্তকরবী' প্রতীকধর্মী নাটক এবং 'প্রতীকধর্মিতায় (যেমন মেতারলিঙ্কের নাটকে) দৃশ্যমান বিশ্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে সঙ্কুচিত করে নেওয়া হয়।' 'মালিনী', 'রাজা ও রানি'ও কাব্যনাট্যের পর্যায়ে পড়ে না। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাটক রচনাকার্যে নিযুক্ত হতে চাননি। কাব্যনাট্যে সেই ক্ল্যাসিক টোটালিটি থাকা দরকার, ভার্জিল লেকচারে এলিঅট যে সহজাত সারল্যের কথা বলেছিলেন, তাও যেমন দরকার, তেমনি গভীর উচ্চারণে চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করে মানবিক 'element'-এর মুক্তি এনে দিতে হবে।

তথাকথিত 'রবীন্দ্র-ঘরানার' কবিদের নিকটে আমরা কাব্যনাট্য আশা করি না। কেননা রোমান্টিক কবিতায় কবির নিজস্ব ব্যক্তিত্বই মুখ্য অথচ নৈর্ব্যক্তিকতা ব্যতীত কাব্যনাটক সৃষ্টি হতে পারে না। রোমান্টিকতা কখনই কাব্যনাট্যের বাহন হয়ে ওঠে না। ফলে শেলীর কাব্যনাট্যে চরিত্রকে পেছনে ঠেলে মঞ্চে এসে দাঁড়ান স্বয়ং কবি। রবীন্দ্রনাথও সে ভাবেই তাঁর কাব্যব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত হয় সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। নাটকের আঙ্গিক ব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তির বাহন হয়ে ওঠেনি। কাব্যনাট্যে থাকে সেই ক্লাসিকাল গুণ যাকে এলিঅট বলছেন, "প্যাসনকে প্রকাশ করা নয় বরং তাকে সীমানায় বেঁধে ফেলা; প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় অনুভবের স্রোতকে বন্দী করে ফেলা, একটা বৃত্ত তৈরি করা, যার সীমানার বাইরে নাট্যকার কখনই পা বাড়াবেন না।" বাইরে তথাকথিত রিয়ালিটি নয় বরং যে ভারসাম্য মনের মধ্যে অর্জিত হয়েছে তাকে ছন্দে শব্দে, ব্যঞ্জনায় বিধৃত করে আবেগকে সংহত করে প্রকাশ করতে হবে। রোমান্টিকতার ব্যাপারে বরং থেকে যায় 'ফ্রি ফ্লো অব ইমোশন।' কাব্যনাট্যে অবশ্যই তা আশা করব না।

কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার রণক্ষেত্রের অগ্রচারীদের নিকটে প্রত্যাশা করা অসম্ভব ছিল না। কয়েকজন সে চেষ্টাও যে না-করেছেন তাও নয়। বুদ্ধদেব বসু সে প্রচেষ্টা সম্প্রতি করছেন। তিনি নিজের মতো ব্যাখ্যা দিয়ে কয়েকটি আর্কেটাইপ অনুভবকে ভিত্তি করেছেন। কিন্তু জীবনের বিষয়ে ক্লাসিক বোধ না হলে তো যথার্থ কাব্যনাট্য সম্ভব নয়। যৌনতা একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্র। তাকে মুখ্য করে, আজকের অনম্বয়িত বিশ্বে মানবিক অন্তঃসারে পৌঁছনো যায় না। অথচ বুদ্ধদেব বসু আর্কিটাইপ বলতে বুঝেছেন সেক্সকেই। অংশ সমগ্রের ইঙ্গিত দিতে পারে অবশ্যই, কিন্তু সে অংশ সমগ্রের চারিত্র্য-লক্ষণে প্রতিনিধিস্থানীয় হতে হবে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর নিজস্ব কাব্য মনোভাবের মুদ্রাদোষে কাব্যনাট্য মাধ্যমটিকে ব্যবহার করেছেন মাত্র।

জীবনানন্দ দাশ এবং বিষ্ণু দের নিকটেই আমরা কাব্যনাট্য পেতে পারতাম, কিন্তু জীবনানন্দ কী বলতে চাইছেন তা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তখন তাঁর লোকান্তর হলো ; বিষ্ণু দে মার্কসীয় দর্শনে অবগাহন করে এবং আপন কবিপ্রতিভার দাক্ষিণ্যে সমাজের সংহত স্মৃতিকে ধরতে পারলেন। তিনিই কাব্যনাট্য রচনায় পথিকৃৎ হতে পারতেন। তাঁরই সহধর্মীরা হলেন লরকা এবং ব্রেখট। বিষ্ণু দের দীর্ঘ কবিতাগুলির কোনো কোনোটিতে সহসা কবিধর্ম ও নাট্যকারের ধর্ম মিলে গেছে, সে প্রশ্রয়ে আমরা আগ্রহী থাকি।

ত্রিশের বেশ কিছু কবির দুর্বলতাসমূহের অন্যতম ছিল—(১) স্বদেশী মহান ক্লাসিকগুলির অপরিচয়, (২) স্বদেশী লোককাহিনী ও লোকগীতির বিষয়ে কৌতূহলহীনতা (৩) এবং নবজাগ্রত ব্যক্তি মানুষের সচেতন উত্তরাধিকার বিষয়ে অমনোযোগ। দ্বিতীয়টি বিষয়ে সজাগ মনস্কতা যেমন ইয়েটস ও লরকাকে কাব্যনাট্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তেমনি তৃতীয়টি বিষয়ে স্পষ্ট মনোযোগ ব্রেখটকে উন্নীত করেছে এপিক থিয়েটারের জগতে। ফলে, বিষ্ণু দের নিকটে আমাদের প্রত্যাশা যত অধিক, অন্যান্য ত্রিশের কবিদের নিকটে ততখানি নয়।

চল্লিশের কবিদের অনেকের কাছেই মানুষের জীবনের কিছু উপরিস্থ অনুভব ব্যতীত পুরো মানুষের অভিব্যক্তি একেবারেই অনুপস্থিত। অবশ্য গৌরবময় ব্যতিক্রমও আছে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'একলব্য' একটি লক্ষ্যণীয় কাব্যনাটক। তবে ভীষ্ম চরিত্রকে আধুনিকীকরণের মধ্যে 'নাটকের নাম ভীষ্ম' মণীন্দ্র রায়ের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই নাটকে সমাজবিধৃত টেম্পোরাল ব্যক্তিত্ব আছে ওপরের তলে আর আর্কিটাইপ ব্যক্তিত্ব আপাত নাট্যবৃত্তের গভীর তলে স্থাপিত রয়েছে, এবং কবি আপন তৃতীয় স্বরের ব্যঞ্জনায় আর্কিটাইপকে দিয়ে মানবিক অন্তঃসারের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। কবি নৈর্ব্যক্তিত্বে পৌঁছেও একটি আবেগবৃত্তকে কখনই ডিঙিয়ে যাননি।

পঞ্চাশের কবিদের শিক্ষা নিতে হয়েছে যে অস্তিত্বের গভীরে, ব্যক্তি-মানুষের অবরুদ্ধ স্বপ্নচারণায় যে ব্যক্তিত্ব অবলুণ্ঠিত—তাকে মুক্ত করে আনতে হবে। 'তোমাকে' 'যখন যন্ত্রণা'র রাম বসুর হাতে তাই কাব্যনাট্যের অগ্রাধিকার জন্মায়, কেননা তিনি তাঁর কবিতায়, এক বিশেষ সময়ের সূচীমুখে দাঁড়িয়ে কবির যে আত্মহননের বেদনা, সেই বেদনাকে স্পষ্ট করলেন বাংলায় ক্লাসিক আদর্শের উন্মোচন করে। প্রকৃতির অন্ধশক্তির মতো মানুষের মধ্যে যে প্রজাতি ভিত্তিক মুক্তিরও অন্ধ বোধ আছে, স্মৃতি উন্মোচনের পথে সেগুলি তিনি ধরেছেন এবং যোগ্য অবজেকটিভ কোরিলেটিভে প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'নীলকণ্ঠ'-এ আধুনিক রূপ নিয়ে উঠে আসে ওথেলো ও ডেসডেমোনা। যেন আন্তিগোন, হ্যামলেট, ওরেস্টিস, মিডিয়া। 'ব্রীজ'-এ শুনতে পাই অহল্যা, ক্লাইমেনিষ্ট্রা ও অম্বার ক্রন্দন। 'রাজকীয় পদশব্দগুলি'ও আর্কিটাইপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ-নাটকগুলির বহিরঙ্গে রয়েছে প্রেম ও প্রেমের মধ্যে যে অনন্বয় গড়ে তুলেছে আজকের সমাজ। অথচ অন্তরঙ্গে রয়েছে কোনো উৎসের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হবার আকাঙ্ক্ষা। এই দুটি তলের গভীরে কবি তাঁর অস্তিত্বের যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়ে দিয়েছেন। রাম বসু ব্যতীত অন্য তরুণ কাব্যনাট্যকারের প্রতি আমরা সমমূল্যে আগ্রহী নই। অবশ্য নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, দিলীপ রায়, কৃষ্ণ ধর, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, তুষার চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ এবং আরও অনেকেই কাব্যনাট্য রচনায় প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে দু-একজনের সাফল্য ছাড়া বাকিগুলিতে কবিতায় অতি রোমান্টিকতার প্রাবল্যে কাব্যনাট্যের মূল ব্যাপারটাই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। বরং হয়ে পড়েছে ঐক্য বিরহিত এলোমেলো উচ্চারণ—যা কুশীলবের মুখ দিয়ে শোনানো হচ্ছে। সেগুলি অভিনয়তো দূরের কথা, পাঠযোগ্যও নয়।

চিত্রকল্প নিয়ে দু-এক কথা

. . . .

লুই আরাগঁ-এর মতে যে-কোনো নতুন কবিতা লিখতে বসে কবির স্মরণে থাকে এতকাল ধরে রচিত কবিতার শৈলীর ইতিহাস। সব অতীত রচনার পরিপ্রেক্ষিতেই নতুন কিছু নতুন করে বলার জন্যেই দরকার নতুন কবিতা। একদা এজরা পাউণ্ড বলেছিলেন পুরনো ছন্দ এবং শব্দগত ব্যঞ্জনা পুরনো মন ও সময়েরই প্রতিনিধি। নতুন কালের জন্য নতুন ছন্দ, শব্দগত নতুন ব্যঞ্জনা এবং অর্থবহ নতুন দ্যোতনার প্রয়োজন। এলিঅট বলেছিলেন বড় কবির অজানতেই সময় তাঁর কবিতার উপরে ছাপ রেখে যায়। এই শতকের এই তিনজন মহারথীর উক্তিতে তেমন খুব তফাৎ নেই, বরং তিনজনই সময়কে মূল্য দিতে চেয়েছেন। সময়তো ব্যক্তি মানুষের কাছেও নানা ধাঁচের। সময় বলতে তো আমরা নিরবধি কালপ্রবাহটুকুই বুঝছি না। বুঝছি, মানুষের ইতিহাসের উদ্বর্তনে বিশেষ কালসীমানা। মানুষের সমাজে যে বোধ ও সংস্কৃতি এবং যে কোনো ঘটনার প্রতি তাৎক্ষণিক মানস প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলে যে যুগচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য-গুলি, বুঝতে চাইছি সেগুলিও। একই সময়ে পুরনো ভারতের এশিয়া-সামন্ততন্ত্রের স্মৃতিবহ বর্ণভিত্তিক মানসিকতার নানা ঘটনা পুঞ্জের প্রতি প্রতিক্রিয়া, বৃটিশের তৈরি করা সামন্তপ্রথার বিভিন্ন শ্রেণীমানসের বিবিধ প্রতিক্রিয়া, শহুরে মধ্যবিত্তের প্রতিক্রিয়া, চলতি অবস্থার কৃষক-শ্রমিক ও আবার উল্টো দিকে পশ্চিমী কায়দায় পরিচালিত উৎপাদন সংগঠনে যুক্ত কর্মীদের প্রতিক্রিয়া—সব মিলে একটি আশ্চর্য পরস্পর-বিরোধী বা স্ববিরোধী কালবোধের সৃজন ঘটেছে আমাদের দেশে। অথচ যুগবৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশেষ কালখণ্ড এত রকম স্ববিরোধিতার মধ্যেও কবিতার জন্ম মুহূর্তে অনন্য প্রবাহ-মুহূর্ত—যে-অনন্যতা সমাজ-গতিভঙ্গের

অন্তঃসার নিয়ে প্রবাহিত, যে অন্তঃসারকে কালবোধের দীপ্তিতে কবিকে অর্জন করতে হয়, গ্রহণ করতে হয়, আত্মস্থ করতে হয়।

কিন্তু পাউণ্ডের নিকটে সময় অনেকটা আপেক্ষিক, অথচ কবির বিচারে তা নির্বিশেষ। "ধরা যাক্, জেরুজালেমে এখন প্রাগূষা, মধ্যরাত্রি যখন হারকিউলিস-এর স্তম্ভের মাথায়। সব যুগই সমকালীন। মরক্কোতে এখনই খৃষ্টাপূর্বাব্দ। রুশদেশে চলেছে মধ্যযুগ। মাত্র কয়েকজনের মনের মধ্যে ভাবীকাল ইতিমধ্যেই নাড়াচাড়া করছে। এ কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য। আপাতকালের চেয়ে সত্যিকারের সময় সাহিত্যের ক্ষেত্রেই স্বাধীন প্রভাব-নিরপেক্ষ। আর সাহিত্যেই বহু মৃতব্যক্তি আমাদের পৌত্রদের সমসাময়িক, আমাদের সমসাময়িক বহু ব্যক্তিই ইতিমধ্যেই আব্রাহামের কোলে শেষ নিদ্রায় শায়িত।" সুতরাং শিল্পের সময়, কবিতার সময়, সৃষ্টির মুহূর্ত, মানুষের শিল্পকর্মের সমস্তকাল ব্যেপে। তবু কবিকে বেছে নিতে হয় সেই অনুষঙ্গ, সেই শব্দ ও সেই ইঙ্গিতধর্মিতা—যেগুলি তিনি তাঁর জীবনযাপনের কালে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতায় এবং ঐতিহ্যগ্রাহ্য পঠনপাঠনগত ধারণা ও বোধের পরোক্ষতায় অর্জন করেছেন। শব্দগুলি সজ্জিত করে এমন বিকাশ সামগ্রিক দ্যোতনায় তিনি উপস্থাপিত করেছেন, যাকে বলছি সুন্দর; এমন-কি বোদলেয়ারও চেয়েছিলেন 'কুৎসিতের মধ্য থেকে সুন্দরকে চুঁইয়ে বের করে আনতে'। অবশ্য সহায়তায় আছে শব্দ, কেননা কবিতা তো 'সেরা শব্দের সেরা পারম্পর্যে সজ্জা'ও বটে।

আধুনিক কবিকে তাই ভাবতে হয়, কবিতা রচনার বিষয়টি কেমন? উদ্দেশ্যে বিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায়, কোনো কোনো বিষয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতেই হয়। কীটসের 'Beauty is truth, truth beauty' রোমান্টিকদের কাছে প্রায় সনাতন ধর্মের মতো। রবীন্দ্রনাথও একদা ঐ উক্তি উচ্চারণে শিল্পকে ঐ সনাতন ধর্মে রাখতে ব্রতী ছিলেন।

তথাপি কবির কবিতা-রচনার উপকরণের মধ্যে যা আছে, তা হলো, যেমন জন কার্ডি বলেছেন "সেই মূল উপকরণগুলি যা সুন্দর আর সত্য নয়, বরং সেগুলি হলো ছন্দ, কাব্যশব্দ, চিত্রকল্প ও আঙ্গিক।" দান্তে সত্যানুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু পর্ব্বতের জ্যোতির পাশে পৌঁছতে অনেক ঘুর পথে তাঁকে যেতে হয়েছে। কবিকে তাই কিছুর দ্যোতনা দিতে, জ্ঞান দিতে নয়, ঘুর পথে চলতে হয়, পথের অংশগুলি ছন্দ, বাক্‌ভঙ্গি, চিত্রকল্প। এবং সবশেষে কবিতাটিকে পরিপূর্ণতা দিতে হলে আঙ্গিক বা স্পষ্ট অঙ্গবন্ধন মেনে চলতে হয়। এজরা পাউণ্ড তো স্পষ্টতই কবিতা বিচারের জন্য তিনটি বিষয়কে স্থির মনে করেছিলেন—(১) মেলোপিয়া, বুদ্ধির চমক, সঙ্গীতের তাৎপর্যে চলে কবিতার বিকাশ, সে সঙ্গীত শব্দেরই হোক অথবা সাঙ্গীকৃত সঙ্গীতের প্রতি প্রবণতা বা ইঙ্গিতই হোক; (২) ইমেজিসম্ বা কবিতা যার মধ্যে চিত্রঅঙ্কন বা ভাস্কর্যকর্ম বিষয়ে অনুভব অতি উচ্চকিত ভাবে পাওয়া যায়; (৩) লোগোপিয়া বা কবিতা ভাষা ছাড়া অন্য কিছুর মতো নয়, যা কিনা শব্দের ও আইডিয়ার মধ্যে বুদ্ধির নৃত্য, এবং আইডিয়া ও শব্দের নানা রদবদল।

আসলে প্রতিটি শব্দই কোনো না কোনো অনুভূতির উত্তরাধিকার দেয়, ধ্বনিগত বিমূর্ত বা এ্যাবস্ট্রাক্ট রূপে। কোনো শব্দ বিশেষ্যবাচক, কোনোটা গুণবাচক ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার কোনো শব্দ চোখ দিয়ে দেখা কোনো বিষয়ও নয়, যথা সঙ্গীত, সুর প্রভৃতি শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য; এবং একেবারে অনুভব সাপেক্ষ, প্রেম, ভালোবাসা বিষয়ক মেটাফিজিক্যাল বিষয়। সে বিচারে প্রতিটি শব্দই চিত্রকল্পের মূলের সঙ্গে জড়িত। "একটি বিশেষ মুহূর্তে চিত্রকল্প এক বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগঘন জটিলতার সৃজন ঘটাল...এই তাৎক্ষণিকভাবে জটিলতার অবদানই পৌঁছে দিল এক ত্বরিত মুক্তির বোধে, মহৎ শিল্পে আমরা যে স্থান ও কালের সীমানা উত্তীর্ণ হবার চকিত বোধ অর্জন করি, যে ত্বরিত

বিকাশের বোধ পেয়ে থাকি এই বোধ সেই একই বোধ। শব্দের সহায়তায় যে চিত্রটি রচিত হলো, তাৎক্ষণিক মূল্যই কবিতার এক বিশাল ভার নির্ঝরের মত মুক্ত করে দিল।" শব্দ বা শব্দপুঞ্জের মধ্যে রয়ে গেছে সেই আশ্চর্য শরীরিণী প্রতিমা, যা শব্দ ছাড়িয়ে উঠেছে, যেন ঋক্‌বেদ সংহিতার বাগদেবীর মতো। 'কেহ কেহ কথা বলিয়াও কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ শুনিয়াও শোনে না। যেমন প্রেম পরিপূর্ণা সুন্দর পরিচ্ছদ-ধারিণী ভার্যা আপন স্বামীর নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করেন।' চিত্রকল্প তেমনি শব্দগুলির আপাত ব্যঞ্জনার গভীরে মূল বোধটিকে ইঙ্গিতে ধরিয়ে দেয়। এবং সেই চমৎকারভাবে তৈরি করা গ্রন্থনা এমন এক অনুভবে উত্তরণ ঘটিয়ে দিল যা কোনো শব্দচয়ন থেকে উদ্ভূত নয় যেন; গোটা বলার মধ্যেই, ঐ বাগপ্রতিমার মধ্যেই তা রয়ে গেছে। কখনো বলার মধ্য থেকে না বলার। কখনো না বলার মধ্য থেকে বলার। কখনো শব্দ থেকে নৈঃশব্দে।

ছন্দ, কাব্যশব্দ, চিত্রকল্প, শব্দের সঙ্গীত, আইডিয়া বা শব্দের মধ্যে বুদ্ধির নৃত্যভঙ্গিমা যাই হোক না কেন এ সব তো কবিতার প্রতিমাটি গড়ে তোলার উপকরণ মাত্র। আমাদের দেশের ধ্রুপদী ব্যাখ্যা অনুসারে অলঙ্কার, রস, ব্যঙ্গ্য ইত্যাদির তাৎপর্যে এদের সমসূত্রে আনা অসম্ভব নয়।

আলোচনার সুরুতেই সময় বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে, সুতরাং কবি সময়ে জীবিত ব্যক্তি বলে, সময়ানুগ বহু বিচিত্র অনুভব তাঁর কাব্য রসগ্রাহ্য করার জন্য প্রয়োজন হয়। তাই দেখা যায়, কবি দৃশ্যমান ও পরিমিত ঘটনার সহায়তায় চিত্রকল্প রচনা ক'রে, আবেগের ভারমুক্ত হতে চান। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপকের আচ্ছাদনের তলাতেও থেকে যেতে পারে ঝকঝকে চিত্রকল্প। চিত্রকল্পের প্রভাব তাৎক্ষণিক। এ-ক্ষেত্রে প্রতীকের কথা ওঠে, কিন্তু প্রতীকের প্রভাব পাঠকের নিকটে বহুলাংশে স্থায়ী। এবং বহু প্রতীক ঐতিহ্য পরম্পরায় মনের

গূঢ় রাজ্যে বসতি করে। সেই প্রতীকগুলিকে আধুনিকতার তাৎপর্যে অন্বিত করে তোলার প্রয়োজন ঘটে। অবশ্য কবির সৃষ্ট প্রতীক কবিকে এক স্থায়ী বোধের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। সমুদ্র, আকাশ, অরণ্য—এ বিষয়গুলি বর্ণনা না করা সত্ত্বেও এরা বিশেষ অনুভূতির কারণ হয়ে থাকে। তাই তা প্রতীকের রূপ পায়। বোদলেয়ারের এ্যালবাট্রস, কীটসের নাইটিঙেল, রবীন্দ্রনাথের বলাকা আমাদের নিকটে ব্যাপ্ত স্থায়ী বিষয়ের অবতারণা করে। 'কিন্তু পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,' বা 'lets his great white wing/Drag like a heavy paddle at his side' কিংবা 'with beaded bubbles winking at the brim,/And purple-stained mouth'—বর্ণনা পাঠচ্ছলে চিত্রকল্পের সহায়তায় বিষয়বস্তুর সন্নিধানে নীত হই। 'সন্নিধানে' শব্দটি আমরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করেছি, কেননা কে কবিতার গভীর অন্তঃস্থলে কবির মতো প্রবেশ করেছে। স্বয়ং, লেখক কবিও কী পারেন? শুধু কবির রচনা থেকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা বা ইমাজিনেশন এবং অনুভবের যথার্থতায় পৌঁছাবার পথের সন্ধান পেলাম। এবং সেই অর্থে আমরা এক বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের সহধর্মিতা পেয়ে যাই। চিত্রকল্প রচনার কাজে তুলনীয়তার মধ্যে এবং সেই অর্থে কবির 'মূল সমরূপিতায় মূল বৈপরীত্য দেখতে ও তাদের পরস্পর সম্পর্কীকরণ বুঝে নিতে হয়। মেনে নিই সমরূপিতার মধ্যে তফাৎ আর তফাতের মধ্যে সমরূপিতা। মানসিকতা জন্ম নেয় সেই তুলনা প্রতিতুলনা থেকে।'

আমাদের সময় বদলেছে আমাদের কবিতায় চিত্রকল্পের গুণগত রূপান্তরও লক্ষ্য করার মতো। তরুণ কবি যখন লেখেন 'আমি মাতাদের চিনি দীর্ঘগলা ঘোটকীর চিঁহি, আমি পিতাদের চিনি—ইঞ্জিনের পিষ্টনের প্রীতি' অথবা, 'আমার রক্তের পাপে ফেনিল উল্লাস দু বাহুতে ঝড়ের দু ডানা', 'শেষ রাতে চাঁদ-জাগা প্রান্তরের সুরা' ইত্যাদি—আমরা

সমধর্মিতার ফলে বক্তব্যের নিকট এসে পৌঁছাই। কবির স্টাইল আমাদের সহায়তা নাও করতে পারে কখনো কখনো এবং মিডলটন মারের উক্তি অনুযায়ী আমরা তো জানি স্টাইল স্বাভাবিকভাবেই লেখকের মুদ্রাদোষে ব্যবহৃত হতে পারে, কেননা স্টাইল ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও আচরণের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। আমরা ঐ ব্যক্তিসাপেক্ষ 'যা অনেক সময় গুণও' সেই ত্রুটিগুলি পাশ কাটিয়ে রসগ্রহণে রত হতে পারি।

আমার সমসাময়িক কবিদের প্রকাশভঙ্গি ব্যাপকভাবে চিত্রকল্প-সাপেক্ষ। তাঁদের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ অনুসন্ধান করলেই এর যাথার্থ মিলবে। যেমন,

(ক) হৃদয়ের শুড়িখানা বন্ধ হলে ভোরের সময় শিশির মুছিয়ে দিক নিঃসঙ্গ পশুর নষ্ট মুখ (রাম বসু); (খ) অন্তরঙ্গ হয়ে যাবে শিকড়ের শান্ত জটলায়। (ঐ); (গ) বটের পাতায় তাহ সকল প্রতিষ্ঠা ঝরে যায় (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত); (ঘ) ঘরের প্রদীপ জ্বালি, দেয়ালের নয়নে কজ্জল (ঐ); (ঙ) হাওয়ার মাদলে ম্লান মিতালির মর্মর কাঁপে উর্মিমালার (ঐ); (চ) তিলটি ঠিক স্বাতন্ত্র্যের শুকতারার মতো জ্বলেছিল (আলোক সরকার); (ছ) অশোক পলাশ গাছ ফুল নিয়ে হেসে উঠেছিল (ঐ); (জ) বিকেল বেলায়/একটি কিংবা হাজার ফুল কথা বলে (ঐ); (ঝ) এ যেন চামেলি নয়, চোখ খুললো, নিবিড় হিজল বনে রাত্রি থমকে আছে (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়); (ঞ) কিছু কিছু পাখী পুরানো বন্ধুর মত শোকতাপ লাগতে দেয় না সামান্য আড়াল করে দাবনা ঢেকে প্রকাণ্ড সূর্যকে (শক্তি চট্টোপাধ্যায়); (ট) তরঙ্গে পড়ে করতালি, ত্যাখো, কাঁপে শতদল, কাঁপে করতল (বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত); (ঠ) দৃশ্যবিহীন অকূলতায় খোলে জলের জটা (শঙ্খ ঘোষ); (ড) প্রবল প্রোথিত চুম্বন—শিহরায় দেওদার বন (ঐ); (ঢ) বয়স্ক বৃক্ষের অসাবধানে শুধু চারাগাছ গৃহপালিত আকাশকে যৌবন দেবে (তুষার চট্টোপাধ্যায়)।

বহু চিত্রকল্প ইত্যাকারে সাজানো যেতে পারে। উদ্ধৃত চিত্রকল্প-গুলির মধ্যে কবির চারিত্রিক দিকগুলি যেমন সুস্পষ্ট তেমনি বাংলা কবিতা-চিন্তার জগতে চিত্রকল্পের রূপান্তরও লক্ষ্য করার মতো।

যে শব্দগুলি নিয়ে এই-যে ছবি আঁকার ব্যাপার, সেই শব্দগুলি নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। মানুষের মুখের কথার শব্দসম্ভারের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলেন সেই কতদিন আগে দান্তে। তারপর রোমান্টিকদের যুগে কোলেরিজ এবং ইত্যাদি। বাংলা কবিতায় সেই মুখের ভাষা আর তার ছন্দ আবিষ্কারতো কম শক্ত নয়। কেন?

বৃটেনে পুরনো মধ্যযুগের সমাজ ক্রমশ ভেঙে পড়ার যুগে, স্তরীভূত সমাজের পতনের মধ্য দিয়ে এক সামাজিক মিশ্রণের সুযোগ এসে পড়ে। পুরনো নর্মান শাসনের ভাষা-ঘরানা ও লাতিন অধ্যুষিত বিদ্যাবত্তা এবং শ্রমজীবী মানুষের আটপৌরে কথা সব কিছু মিলে এক আশ্চর্য রসায়ন ঘটে যায়। কলকারখানা বিকাশের মধ্য দিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-প্রশাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতির তাৎপর্যে একটি সামান্য ভাষাও গড়ে উঠতে থাকে। আসলে আটপৌরে কথার মধ্যেই আছে আশ্চর্য ব্যঞ্জনাগুলি। সেই সামান্য ভাষা গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে ইংরেজি কবিতা নতুন মুক্তি পায়। তার শব্দস্পন্দনে এসে যায় লোকমুখের ছন্দ। কবিতায় তাকে আবিষ্কার করা শক্ত হলেও একেবারে দুরূহ হয়নি।

কিন্তু আমাদের দেশে? কতদিন, কতদিন ধরে বর্ণ ও শ্রেণীভিত্তিক সমাজে যেন দুটি ভাষাতলের প্রচলন রয়ে গেছে। তাছাড়া স্থানগত বৈপরীত্য তো আছেই। রয়েছে কত রকমারি উপভাষা। উপভাষা-গুলিতেই আছে আটপৌরে ব্যঞ্জনার স্বর্ণখনি। অথচ সামান্য ভাষা—যা অনেকখানি বাবুদের একটি আঞ্চলিক ভাষা, তার মধ্যে সেই সম্পদের ব্যঞ্জনা কোথায়? কবিদের তাই যন্ত্রণার শেষ নেই। নিরবধি বাছাই-এর কাজ করছেন তাঁরা লোক-শব্দমঞ্জুষা আর উচ্চকোটি সমাজের

বিশেষিত শব্দভাণ্ডারের মধ্যে থেকে। লোকমুখের ভাষা ও সামান্য শব্দের ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে যেচিত্রকল্প তাকেও গড়ে তোলার কাজে তাই সমস্যারও শেষ নেই। বিষয়বস্তু ও ভাষার এই সংগ্রাম পশ্চিমী যে-কোনো দেশের কবির চেয়ে বাঙালি কবির কাছে অনেক দুশ্চরতায় সমাকীর্ণ! অথচ, 'লৌকিকে কহিলে সবে শোনে মন দিয়া'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প রচনায় দেখছি যথেষ্ট জটিলতার নিরিখ। তরুণ কবিদের প্রথম যৌবনকে দীর্ণ করে দেওয়া আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশের কমিউনিস্ট আন্দোলন স্বপ্নাতুর মনোজগতে এনেছিল সম্ভাব্য ফসল-ফলা প্রান্তরের প্রশান্তি। বরং শহরে প্রবাসী তরুণ কবিদের কাছে সাম্যবাদ বলতে মূলত বুঝিয়েছে কৃষকের মুক্তিই। সেই সংগ্রামই তখন চিত্রকল্পে মুখ্যত ধরা পড়েছিল। যেমন ঐ সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি রাম বসু লিখেছেন 'আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক', 'নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ' অথবা 'সে যেন সজল সন্ধ্যা বসে আছে পাহাড়-চূড়ায়'। লিখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমুদ্রের দোলনা থেকে দিগন্তের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আকাশের আঙিনাতে/মেঘের বিরাট শিশু লুফে নিলে নারিকেল বাহুকে বাড়িয়ে'। তরুণ কবিরা, যেমন মৃগাঙ্ক রায়, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, অসীম রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, কৃষ্ণ ধর, ধনঞ্জয় দাশ, রোহীন্দ্র চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বাইরের বিশ্বের ছবির সাহায্যে বাজিয়ে তুলেছিলেন মনের মধ্যেকার নক্সা। তাঁদের অবজেকটিভ কোরিলেটিভে এসেছে বিস্তীর্ণ ভূগোল, প্রকৃতির নানা রূপ, সংগ্রামরত স্বদেশ। এঁদের মধ্যে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তার পরেও, তাঁদের চিত্রকল্পে এসেছে রূঢ় পাহাড়, শূন্য মাঠ, শুকনো নদীর খাত এবং এক পরম বিষাদ। যেমন

সিদ্ধেশ্বর সেন মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেছেন '......অবিলোপী/খোয়াইয়ের পাটাতনের উপর বিচ্ছিন্ন, এক/প্রবল মূর্ছায় মুক্ত-বর্ণ/প্রকৃতি।'

এঁদের পর মুখ্যত যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে কারো কারো আবার প্রকৃতির ব্রজনিসর্গে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বড় বেশি করে ধরা পড়েছে। উদ্ধৃত অংশে অলোকরঞ্জনের রচনাগুলিতে সে অনুষঙ্গ অনেক বেশি স্পষ্ট। 'বটের পাতা', 'প্রদীপ', 'কজ্জল' 'মাদল' যেন সাঁওতালি ব্রজনিসর্গের সমাহিত শান্তির কথা মনে পড়িয়ে দেয়—কবি যেখানে আজন্ম গ্রামীণ কালকেতুর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। আলোক সরকার চেয়েছিলেন যেন শিশুর চোখে বিস্ময়ময় বিশ্বের ঐক্য। বেদনাময় বাস্তবতা থেকে বার বার তিনি ফিরে গেছেন শহর নিসর্গেরই অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতির হয়তো কোনো বিস্ময়কর উন্মোচনে। তাঁর ফুল, পাখি, বটগাছ, বারান্দা এক একটি স্বতন্ত্র বিশ্বের ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় অস্তিত্বের বিষণ্ণতা কবিকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে অকৃতার্থ বাসনাগুলি থেকে। কখনো রমণীর কাছে, কখনো শহুরে প্রকৃতি ও আদিম প্রকৃতির সম্মিলনে ধরতে চেয়েছেন তিনি পায়ের তলায় মাটিহীন অস্তিত্ব থেকে উত্তরণ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আছে বাহারি শব্দের নানা চমক আর সেই চমকের মধ্যে খেয়ালিপনায় একটি চিত্রকল্প গড়তে না গড়তেই, তাকে ভেঙে ভিন্নতর চিত্রকল্প গড়ে তোলেন তিনি। তবু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঝোঁক লোকমুখের শব্দের দিকে। অমিতাভ দাশগুপ্ত একেবারে বাঙালি জীবনের লোকচ্ছবি থেকে চিত্রকল্প তুলে আনতে পারেন আশ্চর্য অবলীলায়, যেমন, 'দুধের বলক দেওয়া আধফোটা কুঁড়ি', 'সূতাশঙ্খ সাপ', 'অনায়াস উলু দেওয়া', 'পানার সরের মতো খুব চাপা', 'বিষের নাড়ুর মতো বোমা' ইত্যাদি। অমিতাভ দাশগুপ্তের আছে সেই আশ্চর্যগুণ—যা দিয়ে তিনি লোকস্মৃতির সঙ্গে শিল্প-ঘর্ঘরিত শহর-প্রকৃতির নানা রূপ বিরোধাভাসে সংযুক্ত

করে দিতে পারেন। শিবশম্ভু পাল শহরের দৃশ্য থেকে তুলে নেন তাঁর নিটোল চিত্রকল্পগুলি, যেমন 'রাজপথ,…যেন আর আকাশের আলোর নিক্ষেপে শরীর সাজানো।' শঙ্খ ঘোষ তাঁর স্নিগ্ধ ভাষণের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত করে দেন অস্তিত্বের হাহাকার। যখন লেখেন 'মস্ত সময়ের দাঁতের কৌটোয়', রূপক হয়ে যায় সমৃদ্ধ চিত্রকল্প। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় শুনিয়ে দেন মানবিক সংরাগে আপ্লুত মুহূর্তগুলিকে 'উদাস-লণ্ঠনে দোলা ছইয়ের ভিতর থেকে ভেসে আসা শ্রাবণের সজল সংসার'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপরবর্তী যে-সব কবির কথা মনে পড়ে, তাঁদের মধ্যে যাঁদের মূলত চলতি কথায় পঞ্চাশের কবি বলা হয় এঁদের কারো-বা কৈশোরই ছিলনা, কারো-বা ছিলনা বাল্য, কৈশোর বা যৌবন। তাঁদের মতো দুঃখী বাল্য-কৈশোর-যৌবন সহসা কোনো দেশের কবির দুর্ভাগ্যেও জোটেনা। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশবিভাগ-বাস্তুত্যাগ-অনিশ্চয়তা এসব নিয়ে চলে গেছে তাদের সুন্দর স্মৃতি গড়ে তোলার দিনগুলি। অথচ তাঁরা যখন কবি হলেন, সেই দুঃখদিনের স্মৃতির ছবি দিয়েই তাঁরা স্বদেশ-স্বকালের মুখ দেখলেন। অবাক হইনা পড়লে শক্তির 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ/ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাত্রে……আর কিছু নয়,' অথবা মোহিত চট্টোপাধ্যায় যখন বলেন 'হয়তো হাতের কাছে খুঁজে পাই নি একতারা অথবা খঞ্জনি/রাইফেল বন্দুক নিয়ে বিলে ঘুরছি ক'জন বৈরাগী'। এবং বিশ্বাসভঙ্গ যখন বেজে ওঠে শুনি, 'আমি যে তোমাকে স্থির মন্দিরের মতো কোনো অটল পাথর ভেবেছিলাম' (সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত) তখন এই বিষাদ হয়ে যায় 'অলৌকিক একগুচ্ছ অদ্ভুত ব্যাণ্ডেজে বাঁধা মৃত্যুর কবিতা' (শংকর চট্টোপাধ্যায়) কেননা, 'গৃহের অলক্ষ্য শীর্ষে শূন্যতার অজস্র সঞ্চয়/সূর্যাস্তের রক্তপাতে অসুস্থতা সময়ের ক্ষয়' (তুষার চট্টোপাধ্যায়)। বলা বাহুল্য এ-সব কবির কবিতায় এক অপরূপ ডিটাচমেন্টে বৈরাগ্য বুকের মধ্যে হাহাকার বাজিয়ে তোলে।

সময় সীমা ধরে কবিতাকে বিচার করা সঠিক নয়, এ আমারও জানা। এমন-কি যুদ্ধোত্তর কবিদের কয়েকজন প্রতিনিধি-স্থানীয়কে নিয়েও এ-ধরনের আলোচনা অবশ্যই কোনো সঠিক পথ-নির্দেশের দাবি রাখে না। তবু নিজের প্রজন্মের প্রতি মমতাবশত এঁদের নিয়েই কথা বলছি। অব্যবহিত পরবর্তী কবিদের মধ্যে কবিরুল ইসলাম, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, সত্য গুহ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অনন্ত দাশ, রত্নেশ্বর হাজরা, গণেশ বসু, রবীন সুর, চিন্ময় গুহ ঠাকুরতা, তুলসী মুখোপাধ্যায়, তরুণ সেন, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস—এমন কি পুষ্কর দাশগুপ্ত বা পরেশ মণ্ডল বিশেষম নস্কতার দাবি রাখেন।

তবুও, আমরা যে-জগতে বাস করছি, আমাদের সাম্প্রতিক চিত্র কল্পের মধ্যে তার প্রভাব বড়ই কম। অদ্যাপিও উদ্যান, বীথিকা এবং নস্টালজিক গ্রামনিসর্গের প্রতি স্মৃতি-প্রত্যাবর্তনগত মমতায় যেন চিত্রকল্পগুলি রচিত হয়। সময় আমাদের জীবনে অনন্বয় ঘটিয়ে দিয়ে নতুন মূল্য দিতে অনেকখানি অপারগ হয়েছে বলেই কী আমরা স্মৃতি-লাঞ্ছন গ্রামনিসর্গের কল্পিত ঐক্যময় রূপকল্পচর্চায় ব্রতী? 'মাতাল স্বামীর ঘরে ভুলে গিয়ে সব ভালবাসা/একটি করুণ হাত গালে চাঁদ আলসে ধরে কাঁদে', 'ছেঁড়া পাজামার নীচে গোড়ালিতে চমকায় পাথর', 'ট্রামের চাকার নীচে হাঁফ ছাড়ে হাওয়ার নিঃশ্বাস', ইত্যাকার-ধর্মী চিত্রকল্প আঁকতে আমিও কখনো কখনো বীতস্পৃহ হই। বরং 'বয়সের যে উদ্যানে ফুটেছিলে হে বধূরা ফুলে', 'বিদ্যুতের ধার ঘেঁষে শুয়ে রইল চিংকৃত প্রদোষ', ইত্যাদি ধরনের চিত্রকল্প নিজের অজ্ঞাতে রচিত হয়ে যায়।

ইমেজিস্ট আন্দোলনের নায়কেরা একদা ইশতেহারে লিখেছিলেন যে যন্ত্রনির্ভর আমলের জীবনযাপনের বিষয়বস্তু নিয়ে বাজে কবিতা লেখার চেয়ে পুরনো বিষয়বস্তু নিয়ে যোগ্য কবিতা রচনাই শ্রেয়। ফিউচারিজম্-এর প্রবক্তা মারিনেত্তি যন্ত্রের আর্তনাদকে আগামী দিনের কবিতার নিরিখ ব'লে কেন্দ্রশাসন ও সামরিকীকরণের ধূয়া ধরেছিলেন একদা।

তথাকথিত এই ফিউচারিজম-এর ছাপ আমাদের কবিতায় কার্যত নেই বললেই চলে। বরং এমন এক অপার বাংলার শ্যামল ছবি আমাদের কবিদের মনের মধ্যে ভাসতে থাকে! অন্যদিকে স্পষ্টতই আমাদের দেশের আগন্তুক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার ক্রমবর্ধমান বেদনায় গ্রাম-নিসর্গের ছবিগুলি ঘনঘন নানা অবজেকটিভ কোরিলেটিভ-এর কাজে রূপ দিতে আসে। তাই কবিদের কণ্ঠস্বর শুনি 'আমি মুক্ত কালকেতু আজন্ম গ্রামীন (অলোকরঞ্জন), 'দশলক্ষ সৈন্য মৃত এক কণা শিশিরের নির্মল আঘাতে' (মোহিত চট্টোপাধ্যায়), 'ফুলের বিছানা দেখে মনে হয়, শূন্যতা যাবার সময় হয়েছে' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়), 'আমার কোনো নাম তো নেই, নৌকা বাঁধা আছে দুটি দূরে সবাই জাল ফেলেছে সমুদ্রে' (শঙ্খ ঘোষ), 'যাবো অন্ধকারে, উৎসমুখে, অম্লান প্রতীক' (রাম বসু), 'জাগরণে চাই নদী চাই জলধারা পায়ে পায়ে' (যুগান্তর চক্রবর্তী), 'যেখানে মরণশীল উদভ্রান্ত মোরগ উড়ে যায় মৃত্যুর পরেও লাল টালি/ বারান্দায়' (উৎপলকুমার বসু), 'বেদনা বাসনা কাঁপে অশ্বত্থের লাল স্বচ্ছ পাতা' (কবিতা সিংহ), 'বাড়িতে না গিয়ে যদি বাহিরের রৌদ্রে চলে যাই/ আলোর ভুবন পাবো, ভালোবাসা না হয় পাবো না' (বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত), 'মায়েরা কস্তা পেড়ে শাড়ির ঘোমটা পরিয়ে উলুধ্বনি দিচ্ছিল' (চিত্ত ভট্টাচার্য), 'বিদায় হে তটরেখা, মন্দির বন্দর শৈলশির' এবং 'বিদায়, বিদায় হায় তটরেখা বালুকা আভাসে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

একথা ঠিক যত দ্রুত উপকরণাশ্রিত জীবনচর্যা বদলায়, তত তাড়াতাড়ি মহত্তম অনুভবগুলি বদলায় না। প্রতীক রচনায়—নদী, সমুদ্র, অরণ্য, নীহারিকা, দর্পণ প্রভৃতির ব্যবহার আমাদের সময়ের সান্ত্বনাহীন নিরাশ্রয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, পাশাপাশি তাৎক্ষণিক মর্যাদা-বিধৃত চিত্রকল্পগুলিও তারই সঙ্গে বেদনা ও বিষাদে গভীরতার স্পর্শ এনে দেয়।

কবিব্যক্তিত্ব, কবিচারিত্র্য ও কবি

. . . .

একটি পুরো কবিতা রচনার বেলায় তো বটেই, নিছক একটি চিত্রকল্প রচনার কাজে কবিব্যক্তিত্বের ভূমিকা নেহাৎ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কবিতো স্রষ্টা এগুলির। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে, সেই কবে বলে-ছিলেন, 'কোনো ব্যক্তি নিজের ছায়া এড়িয়ে হেঁটে যেতে পারে কি?' আবার কবির চারিত্রিক বিশিষ্টতার মধ্যে যেগুলি খুবই দৃশ্যমান, সেগুলি-যে কবিতাতেও বিম্বিত হবে এমন কোনো কথা নেই, কবির ব্যক্তিগত অনুভব বা অভিজ্ঞতা—যেগুলি তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ —এমন হতে পারে সেগুলির ভূমিকাই নেই কবিতার ক্ষেত্রে। এলিঅটের মতে, এ অর্থে কবিতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, বরং ব্যক্তিত্ব থেকেই মুক্তি। কবিব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার মধ্যেই আছে কবিতার উৎসার। তা হলে কি কবিব্যক্তিত্ব ও কবিতা উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটি খুবই ক্ষীণ? আমাদের তো ধারণা বরং চিত্রকল্প রচনার কাজে কবির কবিব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে কার্যকরী থাকে। আমরা এক্ষেত্রে 'ব্যক্তিত্ব' নয়, কবিব্যক্তিত্ব শব্দটি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করছি।

একদা ফ্রয়েড-মনস্ক হার্বার্ট রীড কবিতা রচনার কাজে এই ব্যক্তিত্ব-প্রসঙ্গটি নিয়ে খুবই ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। হার্বার্ট রীড-এর ব্যক্তিত্ব বিচারের পন্থাটি কতখানি বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক, তা বিচারে না গিয়েও বলা যায়—তাঁর বিষয়ীগত ব্যাখ্যার দিকটি ভাবতে মাঝে মধ্যে মন্দ লাগেনা।

ফ্রয়েডের অনুসরণে ব্যক্তির মনোজগৎ তিনি সচেতন, প্রাক-সচেতন, অ-সচেতন এই তিনস্তরে বিধৃত বলে ধরে নিয়েছিলেন। তিন স্তরীভূত মনো-

জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিরই মানসিক পদ্ধতির একটি সুসমঞ্জস সংগঠন আছে। একে ফ্রয়েড বলেছেন ইগো। এই সচেতন মন থেকেই কেবল নয়, ব্যক্তির অন্যবিধ বহু প্রকাশ ও ক্রিয়া কলাপকে ইগোই অবদমন করে রাখে। এই অবদমিত ইগোর নৈর্ব্যক্তিক দিককে ফ্রয়েড বলেছেন ইদ। সমস্ত জীবন ধরে ইগো যেন প্যাসিভ। আমরা যেন অজ্ঞাত ও অনিয়ন্ত্রিক কিছু শক্তির দ্বারা জীবন কাটাই, we are 'lived'; এই শক্তিগুলি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আলাদা হয়ে থাকে—এ হলো সেই সঞ্চয়ের সিন্ধুক বা ইদ যার মধ্যে আমরা আমাদের প্রবণতা ও আবেগগুলি অবদমিতভাবে জমিয়ে রেখেছি। রীডের মতে ইগোতে আছে 'ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক সংজ্ঞা কিন্তু শিল্পী বা কবির ব্যক্তিত্বে আরও অনেক কিছুই যোগ করা দরকার'।

কোনো এক ধরনের স্থির প্রত্যয় অনুযায়ী বহির্জাগতিক ঘটনার একদেশদর্শী প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র 'চারিত্র্য'-লক্ষণই প্রকাশিত করে। বলাবাহুল্য চরিত্র বস্তুটি "আসলে আগে থেকে ঠিকঠাক করে নেয় কোনটি মানবো আর কোনটি মানবো না এমনি ধারা কিছু নিজের তৈরি করা নীতি-নিয়মের বশীভূত মন ও ব্যবহারের সাযুজ্য। এ ধরনের পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার চৈতন্যের স্রোতের উপর চাপিয়ে দেয় নানা বাধা নিষেধ মানা না-মানার চাপ।" "স্রোতের ধারার চারিত্র্য ও লক্ষ্য দুই-ই ধরা পড়ে তার দুটি তীরের বন্ধনের তাৎপর্যে।" ডঃ রোবোক এ বিচারে ঠিকই বলেছেন, "চরিত্র হলো একটি দীর্ঘকাল ব্যাপী মানস-শারীর অবস্থান—যা কোনো না কোনো নিয়ন্ত্রণী নীতির উপরে ভিত্তি করে প্রবণতামূলক উৎসারগুলিকে বিশেষ তারে বেঁধে ফেলে"। ম্যুনস্টারবার্গকে উদ্ধৃত করে রীডও বলেছেন চরিত্র হলো "সমস্ত জীবন ব্যাপী নির্বাচিত প্রবণতাকে প্রকট করে রাখবার শক্তিবিশেষ"। এক কথায় চরিত্র হলো সেই নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ যা কোনো ব্যক্তি বাছাই করে নেয় এবং সেই আদর্শের দাবিকে

মেনে নিয়ে সে ব্যক্তি সেন্টিমেণ্ট বা ভাবপ্রবণতার দাবি বিশেষভাবে অস্বীকার করে। কবির ব্যক্তিত্বে কেবল ইগো নয়, ইদও রয়েছে। কবি'চারিত্র্যে' রয়েছে কেবল নির্ভেজাল প্রত্যয় নির্দেশিত ইগো।

সুতরাং কোনো 'চারিত্র্য'-বিশেষত্ব যদি কবির ধ্যানজ্ঞান হয়, তাহলে কবির ব্যক্তিত্বই গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব গড়ে নেবার ব্যাপারে প্রাক্-সচেতন বা প্রি-কনশাস-এর ভূমিকা কম নয়। ইয়ুং দেখিয়েছেন, চরিত্রের খাতিরে আমরা যে অনুভব ও আবেগগুলির অবদমন ঘটাই, সেগুলি অবদমিত হলেও কল্পনার রাজ্যে তাদের আধিপত্য শেষ হয়ে যায় না। বরং "বুদ্ধিবাদীর অ-সচেতন মনের ক্রিয়া অদ্ভুতভাবে অতিকল্পনাময়, ফ্যানটাস্টিক। প্রায়শই তা সচেতন বুদ্ধিবাদীর ক্রিয়ার একেবারে বিপরীত"। এ ধরনের অ-সচেতন অনুভব আকস্মিক আবেগ-উদ্বুদ্ধ, অনিয়ন্ত্রিত, খেয়ালি, অযৌক্তিক, আদিম, আর্কাইক, অনেকটা প্রাক্-সভ্য মানুষের অনুভবের মতো। মানুষের আর্কিটাইপ অনুভব-গুলির স্থায়ি বাস রয়েছে এই মনোরাজ্যে।

কিন্তু শিল্প তার উৎসকে ছাড়িয়ে ওঠে। শিল্প প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে। তাই ঐ অনুদ্ঘাটিত মানসলোকের রহস্য যদি অপর ব্যক্তির মধ্যে সাধারণীকরণের সাহায্যে না পৌঁছায়, তাহলে শিল্প কখনো গ্রাহ্য হবার নয়। কেবলমাত্র অ-সচেতন থেকে এই-যে কল্পনার অভিযাত্রা, একে বলব ফ্যান্সি। চেতন ও প্রাক্-সচেতন এবং এই দুটি মনের মধ্যে সংযোগ ঘটার মধ্যেই গড়ে ওঠে সত্যিকারের কল্পনা বা ইমাজিনেশন। রীড কবিব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই চেতন ও প্রাক্-সচেতন স্তরের ভূমিকাকে মর্যাদা দিয়েছেন। কবির চিত্রকল্প অনুধাবন ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই প্রাক্-সচেতন মনের ভূমিকা অনেকখানি।

কবিব্যক্তিত্বে চিত্রকল্পটির স্বরূপ কেমনধারা? কোনো একটি বিশেষ অনুভব পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য, এমন-কি কবির নিজের

কাছেও অনুভবের যথার্থকরণের প্রয়োজন এক ধরনের পারস্পরিক সংযোগ বা করেসপণ্ডেন্স গড়ে তোলে। গণিতের কার্ডিনাল সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে সমসংখ্যক বস্তুর সাধারণ প্রতীক যেমন সংখ্যাটি—তেমন বিমূর্ত করেসপণ্ডেন্স কবিতার ভাষায় সম্ভব নয়। কবির ভাষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিরই প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিরঙ্কুশ কোনো দৃশ্য, বা নিসর্গকে জীবনধর্মী কোনো বস্তুর সঙ্গে করেসপণ্ডেন্সে এনে অনুভবকে প্রকাশিত করা, এবং ঐ তাৎক্ষণিক প্রকাশের মধ্যে অনুভবকে বাহনযোগ্য অনুভব-সাপেক্ষ চিত্র দিয়ে বিধৃত করা—এই হলো চিত্রকল্প রচনার ব্যাপার। আর এই চিত্রকল্প রচনায় প্রাক-চেতন স্তর থেকে উঠে আসে আত্মসমাহিত বহু ছবি যা লুকিয়ে থাকা দৃশ্যমান বা অনুভবকৃত মুহূর্তকে শব্দচিত্রে বিধৃত করতে পারে। এ ভাবেই কবির বাইরের দৃশ্যমান অভিজ্ঞতাকে মানবায়িত করে প্রকাশ করা হয়। চেতনার সামঞ্জস্যকৃত সৌসাম্য রচনার ব্যাপারটি না-থাকলে, চিত্রকল্পটি সঠিক হবে না। চিত্রকল্পের ছবিটি প্রাক-চেতনার ক্যামেরার মধ্যে অন্ধকার গর্ভে লুকিয়ে আছে। তাকে ঠিক মতো ডেভেলপ করা চেতন-মনের রসায়নের তাৎপর্যেই সম্ভব। এবং যোগ্য মানবকেন্দ্রিকতার তাৎপর্যে তাকে তারপর যোগ্য মাধ্যমে প্রিন্ট করা যেতে পারে।

যে মুহূর্তে প্রাক-চেতন মনোস্তর থেকে শব্দটি বহন করে আনল কোনো স্মৃতি, তৎক্ষণাৎ জন্ম নিল এক আবেগ। ফলে কবিতা হয়ে উঠল 'আবেগগত অভিজ্ঞতাগুলির এক সংগঠিত রূপ'। এই সংগঠনের কাজে সচেতন মনের কাজ অনেকখানি। এভাবে ব্যক্তিত্ব কবিতার রূপগঠনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। চিত্রকল্প বাছাই করার ব্যাপারে কবিব্যক্তিত্বটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য হার্বার্ট রীড আধুনিক মানুষের শিল্প-প্রতীক্ষাকে বলেছেন—"কোনো কোনো প্রতীক অ-সচেতন-এর নিহিত পাতাল থেকে কোনো সহায়তা ছাড়াই উঠে আসে"।

সত্যিই কি প্রতীকগুলি সহায়তা ছাড়াই উঠে আসে? কবিতা ব্যাপারটাই তাহলে হয়ে পড়ে নিজ্ঞানের বিষয়। আর্কিবল্ড ম্যাকলীশ ঠিকই বলেছেন, "আর অবশ্যই, এভাবে কবিতা রচনার কথা ভাবতে গেলে কবিতার প্রকৃতি সম্পর্কেও একই ভাবে ভাবতে হবে। যদি অ-সচেতন থেকে প্রতীকগুলির উত্থানের জন্য নিষ্ক্রিয় প্রতীক্ষা বলেই শিল্পকে মনে করি তাহলে একটি কবিতা হয়ে পড়ে গোপন এবং সম্পর্ক বিরহিত ঘটনা, কবিতা তা হলে এলোমেলো আর্তনাদ, অন্ধকারে সেই বিখ্যাত ওড-এর নাইটিঙেলের গান শোনার মতো"।

কেবল কি জনৈক ব্যক্তিই কবিতাতে সম্পর্কিত? বাইরের বিশ্ব নয়? বরং বাইরের বিশ্বের কোনো ঘটনার আঘাত, এমন কি স্মৃতি বিধৃত কোনো শব্দের বা প্রতীকের উচ্চারণ, কিংবা স্মৃতি-রোমন্থনের মধ্য দিয়েও আবেগের জন্ম হতে পারে। 'আর স্থির শান্ত মনে আবেগের স্মরণক্রিয়া'ই হোক, বা এলিঅট কথিত 'আবেগগত অভিজ্ঞতা সমূহের সংগঠন'ই বলা হোক—কবিতার জন্ম ঐ উদ্বোধক প্রভাবগুলি এড়িয়ে যেতে পারে না। লু চি ছিলেন প্রাচীন চীনেব বিশিষ্ট এক কবি, এমন-কি সম্মানিত সৈন্যাধ্যক্ষও। ৩০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। লু চি একটি গদ্যকায়দার ফু-কবিতাতে লিখেছিলেন:

"সমস্ত বস্তুজগতের কেন্দ্রভূমিতে কবি নিয়েছেন তাঁর স্থান। সেখান থেকে তিনি গভীর ভাবনা নিয়ে দেখছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য;

তিনি তাঁর আবেগ আর তাঁর মনকে ভরে তুলছেন পুরনো দিনের শ্রেষ্ঠ রচনায়। চার ঋতুর সঙ্গে পা মিলিয়ে হেঁটে যান কবি, বয়ে চলে যাওয়া সময়ের প্রতি রাখেন দীর্ঘশ্বাস;

অসংখ্য বস্তুর প্রতি তাঁর চোখ পড়ে, তিনি ভাবছেন দুনিয়ার জটিলতা।

পরুষ হেমন্তের ঝরে পড়া পাতার প্রতি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর বিষাদ।

সুগন্ধী বসন্তের কোমল কুঁড়িতে তাঁর আনন্দ। বুকের মধ্যে বিস্ময় নিয়ে তিনি অনুভব করেন শৈত্য ;
পবিত্র তাঁর আত্মা, মেঘের প্রতি পড়েছে তাঁর চোখ। তাঁর পূর্বসূরিদের চমৎকার রচনাবলীকে তিনি করছেন আবৃত্তি ;
বিগত শ্রেষ্ঠদের পরিচ্ছন্ন সুগন্ধ বুকে নিয়ে তাঁর আত্মমগ্ন গুঞ্জন।
সাহিত্যের অরণ্যে তিনি ভ্রাম্যমান, শ্রেষ্ঠ শিল্পের জয় গাইছেন তিনি।
আবেগদীপ্ত হলেন কবি। বইপত্র সরিয়ে রাখলেন দূরে আর তুলে নিলেন লেখার তুলিটি, এবার তিনি নিজেকে প্রকাশ করবেন অক্ষরে।"

ম্যাকলিশ ঠিকই ধরেছেন। লু চি 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য',—'চার ঋতু',—'অসংখ্য বস্তু' 'দুনিয়ার জটিলতা' কথাগুলি বলছেন। কবিতা তাঁর মনের মধ্যে একেবারে 'আপনাতে আপনি বিকশি' ধরনের কিছু নয়। সমুদ্র থেকে ভেনাস উঠে আসছেন তাঁর নিজের গতিতে—এমন কোনো প্রতীক নয়, বরং ঠিক তার উল্টো, আমরা পাই একটি ব্যাপক সেতুবন্ধ—একটি চিত্রকল্প—একটি কবিতা—অন্তর্বর্তী একটি স্থান—'যে স্থানটির জন্য আমরা সবাই অন্বেষণ করছি—একদিকে আমরা অন্যদিকে বিশ্ব এই উভয়ের অন্তর্বর্তী স্থান।' 'আমাদের' ও 'বিশ্বের' মধ্যে যে অনন্বয় বা অ্যালিয়েনেশন রয়েছে, তাকেই সেতুবন্ধে মিলিয়ে দেয় কবিতা। কবিতাটির সেতুবন্ধে বিশ্বজগতে পৌঁছলে বিশ্বটিও আর আগের অচেনা বিশ্ব থাকেনা তার অনেকখানি বদল ঘটে যায়। আর যে পাঠক কবিতার সেতুতে পা দিয়ে এগিয়েছে, পথ চলতে সে ব্যক্তিটিও আর আগেকার মতো থাকেনা। সেও বদলে যায়।

প্রসঙ্গত ডিরাক-ওপেনহাইমারের কথোপকথন মনে পড়ে যায়। প্রফেসার ডিরাক বার্লিনে তরুণ গবেষক হার্ভার্ড স্নাতক ওপেনহাইমারকে বলেছিলেন, "শুনেছি পদার্থবিদ্যা গবেষণার সঙ্গে তুমি নাকি কবিতা-লেখাও মিলিয়ে নিয়েছ।" ওপেনহাইমার অপরাধ কবুল করলেন।

ডিরাক আত্মমগ্নভাবে বললেন "সহজভাবে ব্যাপারটা আমি বুঝতেই পারছি না ! লোকজন যা আগে জানতে পারেনি, বিজ্ঞানের কাজ হলো এমন ভাবে বলা যাতে তারা সবাই তা বুঝতে পারে। কিন্তু কবিতার বেলায়…।" ওপেনহাইমার এবারও বলেছিলেন "ঠিকই বলেছেন।" অর্থাৎ সবাই যা জানে আগে থেকেই যেন, কবিতায় তাকেই এমনভাবে উপস্থাপনা করা—যাতে মনে হবে ব্যাপারটা সত্যিই অজানা। আর ঐ অজানাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে বাস্তব বিশ্বকে আরও বেশি করে জানা হয়ে যায়।

এমনিতে আমরা বাস্তব বিশ্বের জানি কতটুকু ? তাই দু-ধাপের ব্যাপার রয়েছে কবিতায়। জানা ব্যাপারকে অজানায় তুলে নিয়ে যাওয়া —অজানা থেকে আবার জানার মধ্যে তার প্রত্যাবর্তন। 'জানা' ধানের বীজ মাটির সৃজনী শক্তির রহস্যময়তায় চলে গিয়ে আমাদের 'অজানা' হয়ে গেল, তারপর তা ফিরে এলো অঙ্কুর থেকে চারা, চারা থেকে ফলবান মুহূর্ত, শস্যশীসে।—একটি ধানের বীজ নয় ; অনেক সংখ্যায় বেশি হয়ে ফিরে আসছে আমাদের চেনাজানায়। কিন্তু চেনাজানা কি ঠিক আগের মতোই ? মাটির রস, উর্বরতা, ঋতু, জল, বীজের নিজস্ব প্রাণধর্ম ও বিকাশের নিয়ম, ইত্যাদি ইত্যাদি, সব কিছু মিলে যা ফসল হয়ে ফিরে এলো, ভাবতে বসলে তার মধ্যে রহস্যময়তার স্বাদ রয়েছে অনেকখানি ! কবিও এমনিই। বাইরের চেনা বিশ্বের বীজ তিনি ফসলে ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু যেভাবে, বিভাসে ও সত্য স্বরূপে প্রত্যাবর্তন ঘটল তার অনেকখানিই মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বাস করার জন্য যোগ্য করেছে। এই যোগ্যতা অর্জনইতো স্বাধীনতা লাভের পথ—মানুষের ইতিহাস-উদ্বর্তনের যা শ্রেষ্ঠতম দিক। একটি চিত্রকল্প হয়ে যায় এ ভাবেই 'জানা→অজানা→জানা'-এর বাহন।

এ হলো অস্তিত্ব থেকে অন্তঃসারে যাবারও পথ। কবি-ব্যক্তিত্ব অন্তঃসারের তাৎপর্যের সঙ্গেই অন্বিত বলে, মুক্তির সঙ্কল্পে কবি নিজেকে যুক্ত রাখেন। যিনি মানুষের অন্তঃসারের প্রতি মনস্ক এবং একই সময়

তাঁর নিজস্ব যুগের শ্রেণীবিভাজনের মধ্যে মানুষের মুক্তির স্বরূপটি ধরতে সমর্থ, তিনি যুগের মূল সামাজিক ও ব্যক্তিক সমস্যা এবং সঙ্কটকে উত্তীর্ণ ক'রে উন্নত স্তরে মানবিক মুক্তির তাৎপর্য প্রকাশিত করেন। অর্থাৎ তিনি কেবল অন্তঃসারটি ধারণই করেন না, তিনি অন্তঃসারটি প্রকাশ করতেও সক্রিয়। যতক্ষণ তিনি অন্তঃসার বিষয়ে অনবহিত, ততক্ষণ তিনি অতীত সাহিত্যই অনুধাবন করেন। প্রকৃতি ও জীবনের প্রতি উন্মুখ হয়ে মানব সমাজের অন্তঃসারটি যেই ধরতে পারলেন—মানুষের অস্তিত্ব ও তার অন্তঃসারের মধ্যেকার ফাঁকটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন, তখনই তাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পদ্ধতির সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত হলেন। যখনই তিনি সক্রিয় হলেন এই ফাঁক বন্ধ করার জন্য, অর্থাৎ অস্তিত্বকে অন্তঃসার-এর দিকে উত্তীর্ণ করার প্রয়োজনে সক্রিয় হলেন, তখনই তাঁর কবিব্যক্তিত্ব গঠন সম্পূর্ণ হলো। সচেতন ভাবে তিনি প্রাক্-সচেতন মনকেও তাঁর আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেললেন।

যে-কবি মানবিক অন্তঃসারকেই মূল বলে ধরে নিয়েছেন, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অর্জন করবার দিক দেখিয়েছেন, তিনি হয়ে ওঠেন গ্রেট পোয়েট-এর লক্ষণযুক্ত। যিনি সমাজের এক খণ্ডিত অংশের অন্তঃসারটি কেবল ধরেছেন, সেই খণ্ডিত অন্তঃসারের প্রতি মনস্ক থেকেই যিনি সৃষ্টিতে সক্রিয়—তিনি মাইনর পোয়েট। আবার যিনি কেবল একটি খণ্ডিত অংশ নয়, সমাজের ব্যাপক অন্তঃসারটি সম্পর্কে মনস্ক ও সক্রিয়—তিনি গ্রেট মাইনর বা মেজর পোয়েট। কয়েকটি সমীকরণে এই কবি-ব্যক্তিত্ব সমস্যাটি স্পষ্ট করা যায়। মানবিক অন্তঃসারকে মুখ্য লক্ষ্য ক'রে যুগের অন্তঃসার অনুধাবন + সক্রিয়তা = মহাকবি। মানবিক অন্তঃসার সম্পর্কে মনস্ক থেকেও মুখ্যত যুগের অন্তঃসার অনুধাবন + সক্রিয়তা = মুখ্য কবি। যুগের অন্তর্গত একটি গোষ্ঠির অন্তঃসার অনুধাবন + সক্রিয়তা = গৌণ কবি। আধুনিক কবিতার ভুবনে এদেশে ও পশ্চিমী দেশগুলিতে মাইনর কবিদেরই ছড়াছড়ি। মেজর ও গ্রেট মাইনর-এর সংখ্যাও আঙুলে গোনা যায়।

গিওর্গি লুকাচ ও কবিতার কথা

. . . .

একথা ঠিক লুকাচ কবিতার উপরে এমন কোনো গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি. যার থেকে বলা যায় তাঁর কবিতা বিষয়ে মতামত সুনির্দিষ্ট ভাবে যুক্তি-পরম্পরায় পাওয়া যাচ্ছে। বরং সবাই প্রায় জানেন সাহিত্য-তত্ত্বজ্ঞ হিসাবে তাঁর মতামত কেবলমাত্র গদ্যে বিধৃত সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বেলাতেই প্রযোজ্য। কবিতা, বিশেষ ভাবে লিরিক কবিতার বিষয়ে তিনি ভেবেছেন, এমন কথা আমাদের তেমন শোনা ছিলনা।

লুকাচের মৃত্যুর ক-বছর আগে তাঁর অশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে হাঙ্গারির গবেষকরা তাঁদের স্বদেশভূমির এ-যুগের এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ মূল্যায়ন করতে গিয়ে, তাঁর কবিতা বিষয়ক মতামতেরও সন্ধান দিয়েছেন। বিভিন্ন রচনা থেকে কবিতার উপরে লুকাচের মতামত সংগ্রহ ক'রে, তাঁরা একটি সূত্রপারম্পর্যও রচনা করেছেন। ইসতভান ঈরোসী কবিতার উপরে লুকাচের মতামতের উদ্বর্তন ও বিচারধারার একটি তথ্যনিষ্ঠ রূপরেখাও দিয়েছেন। লুকাচ জীবিতকালে ঐ রচনার প্রতিবাদ করেননি ব'লে, ধরেনিচ্ছি ঈরোসী ঠিকই লিখেছেন।

সে যাই হোক, গিওর্গি লুকাচের কবিতাবিষয়ে আদৌ কোনো মতামত আছে কিনা এ ব্যাপারে তাঁর রচনাশৈলীই যেন ছিল এক প্রতিবাদ। কবিতা-আলোচকরা অনেক ক্ষেত্রেই এক ধরনের আবেগময় ভাষায় ও সাবজেকটিভ কায়দায় কাব্যবিচার করেন। আবার কেউ যদি বস্তুনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন, তাঁর রচনাতেও কবিতার সাংগঠনিক দিক নিয়ে এত তৎপরতা থাকে যে কবিতার ভাববস্তুই বা কি, কবিব্যক্তিত্বের

কতখানিই-বা তাতে প্রকাশিত এসবের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। লুকাচ কিন্তু এমন তন্নিষ্ঠভাবে প্রায় শীতল বিজ্ঞানমূলক লিখনশৈলীতে অভ্যস্ত ছিলেন যে যাঁরা সাম্প্রতিক পশ্চিমী দেশের সমালোচনাই বেশি পড়তে অভ্যস্ত, তাঁদের মনে হবে তাঁর লিখনশৈলীই যেন কবিতা বিষয়ে মতামত দেবার পরিপন্থী।

অতিকথন দোষ-মুক্ত লুকাচের ভাষা নন্দনতত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত ও স্পষ্ট এক মানবিক শাস্ত্রে রূপ দিতে আগ্রহী ছিল। রসশাস্ত্রকে তিনি সমাজবিজ্ঞানের অংশীভূত বলেই মনে করেছেন, নন্দনতত্ত্বের নিয়মাবলীও ছিল তাই তাঁর কাছে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশেষিত।

লুকাচের কবিতা বিষয়ে মতামত সাধারণ রসশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর মনোভাবেরই অনুকূল। কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি প্রতিফলনের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রতিফলনের তত্ত্ব কলাশিল্পকে পুরোপুরি ভাবে মানব সম্পর্কীয় বা অ্যানথ্রোপমরফিক বলে দেখতে চায়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী শিল্পের, বিষয়বস্তু মানুষের সম্পর্কে রসগত অনুভবের তাৎপর্যে অন্বিত। এ সম্পর্ক বিশেষিত বা স্পেসিফিক। এবং তা ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় সৌন্দর্য উপভোগকেই বিধৃত করে প্রকাশিত।

মানবকেন্দ্রিক ব্যাপারটা বুঝতে গেলে, তার বিপ্রতীপে বৈজ্ঞানিক বিচার পন্থাটিকে আলোচনা করা প্রয়োজন। যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো, নির্মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুকে দেখতে হবে। মানুষের অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক—বস্তুগুলির অস্তিত্ব তো রয়েই গেছে। মানুষের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ ভাবে ধারণাগত ও সাধারণ তত্ত্বের প্রকাশই হলো প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কাজ। অর্থাৎ বিশেষকে সাধারণীকরণই হলো বিজ্ঞানের স্বাভাবিক আবেদন।

অন্য দিকে, বিজ্ঞানের একেবারে অন্য মেরুতে, কোনো অনন্যকে সাধারণ সত্যে নিয়ে যাওয়াই হলো কলাশিল্পের কাজ। এই সাধারণীকরণই পাঠকের মনে তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়ে ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ-

ভাবে সৃজন ঘটায় সৌন্দর্যানুভূতির। বলা চলে কলাশিল্প উপভোগের ক্ষেত্রে, প্রথমে অনন্তকে করছে সাধারণীকরণ; সেই সাধারণীকরণ তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার দাক্ষিণ্যে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক সৌন্দর্যানুভূতির আবেদন সৃষ্টি করে; এই উভয় কেন্দ্রগামিতা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দাক্ষিণ্যে নির্দিষ্টতার পরিক্রমণমণ্ডলের জঙ্গমভূমিতে জন্ম দেয় এক নতুন গুণের। লুকাচ বলবেন, এই হলো কলাসৃষ্টির ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার প্রকৃতি। অপর পক্ষে, সাধারণ ঘটনাবলীর নির্যাসে প্রবেশ ক'রে, অনন্য নিয়মের আবিষ্ক্রিয়াই বিজ্ঞানের মানব-সম্পর্ক-নিরপেক্ষ প্রকৃতি নিরূপণ করেছে।

যে-কোনো কলাশিল্পের আঙ্গিকের আলোচনায় এই বিচারপদ্ধতি লুকাচ প্রয়োগ করবেন। কবিতা বা চিত্রকলা, ভাস্কর্য—যে-কোনো সমমাত্রিক বা হোমোজিনিয়াস শিল্প-আঙ্গিক ব্যবহার করতে হলে, শিল্পী তাঁর মানসিকতায় মানবজগতকে পরিপূর্ণভাবে সাঙ্গীকরণের প্রয়োজনে, সেই মানসব্রহ্মাণ্ডে গভীরভাবে প্রবেশ করেন এবং ঐ মানসিকতা ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যানুভূতির তাৎপর্যে শিল্পমাধ্যমটির উপরে প্রয়োগ করেন।

চিত্রী বা সঙ্গীতকারের কথাই ধরা যাক। চিত্রী তাঁর সমগ্র সত্তা বিশুদ্ধ দর্শনক্রিয়ায় ন্যস্ত করেছেন। সঙ্গীতকার শ্রবণের মধ্যে আপনার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছেন। এ-দুটি শিল্প-আঙ্গিক তো বিশুদ্ধ মাধ্যম, সমমাত্রিক বা হোমোজিনিয়াস। কিন্তু শব্দের সঙ্গে উঠে আসে অনুষঙ্গ, স্মৃতি এবং তার সামাজিক তাৎক্ষণিক তাৎপর্য। শব্দতো বিশুদ্ধ স্বর বা রং নয়। লুকাচ কিন্তু কবিতার ভাষাকে ঐ সমমাত্রিক বিশুদ্ধ শিল্প-আঙ্গিকের মতো করে দেখতে চান! শব্দ-বিধৃত শিল্প-আঙ্গিকগুলির মধ্যে কবিতাই বিশুদ্ধ ও সমমাত্রিক আঙ্গিক।

কিন্তু লুকাচ যে প্রতিফলনের তত্ত্বের কথা বলেছেন, তাকি দর্পণসম্মত ভাবে আমাদের অতি জানা-চেনা?

প্রতিফলন বা রিফ্লেকসন আমরা আপাত-দৃষ্টিতে যেমন মনে করি, লুকাচ কখনই তেমনভাবে ভাবেন নি। অর্থাৎ তিনি কখনই দর্পণসম্মত প্রতিফলনের কথা বলেন নি। তাঁর বক্তব্য বরং একেবারে অন্যরকম। পথ-চলতি প্রায়শই আমরা এমন অনেক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হই, যাঁরা রাজনৈতিক ও সমাজদর্শনে একটা মোটা রূপরেখা, যেমন ইতিহাসের বস্তুসম্মত বিশ্লেষণ প্রভৃতিতে বিশ্বাসী; তাঁরা বহু সময়েই রাজনীতির অতিপ্রত্যক্ষ বিষয়পুঞ্জের প্রতিফলন কবিতায় না দেখতে পেলে সমালোচক হয়ে ওঠেন। তেমন কোনো প্রতিফলনের কথা লুকাচ বলেন নি। লুকাচের বক্তব্য হলো যে, প্রত্যক্ষ প্রপঞ্চপুঞ্জ বা ফেনোমেনা কিংবা প্রচলিত বিমূর্ত বা অ্যাবসট্রাক্ট নিয়ম ইত্যাদির শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলন ঘটে না। বরং বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রপঞ্চপুঞ্জ এবং অন্তঃশীলা অ্যাবসট্রাক্ট নিয়মাবলী পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে এক নতুন বাস্তবতার সৃজন ঘটায়—যার 'অপ্রত্যক্ষায়ণ'ই হলো শিল্পের বিশেষ গুণ। কিন্তু এই অপ্রত্যক্ষায়ণ অবশ্যই বাস্তবাবস্থা অপেক্ষা ন্যূন। কেননা ঘটনা বা জীবনের বিপুলতা ও তাদের আভ্যন্তরীণ জটিল সম্পর্ক কলাশিল্পের পক্ষে কখনই পরিপূর্ণভাবে দেখানো সম্ভবপর নয়। কিন্তু অন্য বিচারে কলাশিল্প আবার প্রত্যক্ষ বাস্তবের চেয়ে ঢের বেশি উজ্জ্বল ও বিশ্বাস প্রতিপাদনে সমর্থ। বাস্তব ঘটনাপুঞ্জের নিষ্কাশিত নির্যাস বা অন্তঃসার এবং যে-বিমূর্ত নিয়মাবলী তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, সব কিছুই একই সঙ্গে ও স্পষ্টভাবে কলাশিল্প প্রত্যক্ষ করে তোলে। অথচ ঢের ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ সৌন্দর্যানুভূতির তাৎপর্যে তা প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠে।

প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের কাল থেকে দার্শনিক ও নন্দনতাত্ত্বিকেরা—এই সেদিন পর্যন্তও মনে করতেন শিল্পকর্মের কাজ হলো অনুকরণ, প্রতিফলন, বাস্তবের প্রতিবিম্বন। যাঁরা পরবর্তীকালে সে তত্ত্বাদি অনুসরণ করেছেন, এর ফলে তাঁদের রচনার কোনো অধঃপতন ঘটে নি। ইরাসাম্মা-লিস্ট দর্শনের রসশাস্ত্র বিষয়ক মতামতের উদ্বর্তনের সূতিকাবাস সম্ভবত

এখনও শেষ হয় নি। কিন্তু এই যুক্তিহীনতার দর্শনের উদ্বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত প্রচার বেড়েই চলেছে যে শিল্পকলা আসলে ঈগো, মানুষের চিরায়ত তৃপ্তি ও আবেগের রূপায়ণ মাত্র। আর লিরিক কবিতার ক্ষেত্রেই 'প্রতিফলনে'র বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি বেশ আপাতদৃষ্টিতে চোখা চোখাও। এমন কী কডোয়েল-এর মতো মার্কসবাদী লেখকও মনে করেছেন, নাটক বা কাহিনীভিত্তিক সাহিত্যকর্ম থেকে লিরিক কবিতা, বাস্তবকে প্রকাশ করা তো দূরের কথা, সেই ম্যাজিকের যুগের সঙ্গে নাড়ির যোগ নিয়ে আত্মমগ্ন মানুষের মানসলোকের আভ্যন্তরীণ স্বরূপই প্রকাশ করে থাকে। আমাদের উল্লিখিত 'প্রতিফলন তত্ত্ব' কবিতার ক্ষেত্রে কী ভাবে খাটবে, অর্থাৎ বাস্তব ঘটনাপুঞ্জ ও নিহিত নিয়মের সম্পর্কে বিশিষ্ট হয়ে অন্যতর বাস্তবের রূপ কেমনভাবে কবিতায় আসবে, লুকাচ কিন্তু 'প্রতিফলন তত্ত্ব' কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেও কেবলমাত্র প্রতিফলনের পদ্ধতিটি এসব ব্যাখ্যার কাজে অন্যতর ভাবে প্রকাশ করেছেন। আমরা কবিতার ক্ষেত্রে লুকাচের তত্ত্বটির এবার অবতারণা করব।

শ্রীইসতভান ঈরোসী-এর মতে, ১৯৫১ সালের লুকাচ কবিতা বিষয়ে স্পষ্ট মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলেন বেচার (Becher) সম্পর্কীয় একটি রচনায়। আমরা লুকাচের নিজের কথারই উদ্ধৃতি দিচ্ছি "পরিপূর্ণ বাস্তবতার ধারণা করা যেতে পারে মাত্র, প্রায় মোটামুটি রকমের কাছা-কাছি পৌঁছানোও হয়তো সম্ভব—বিশেষভাবে প্রপঞ্চপুঞ্জ ও অন্তঃসারের বস্তুগত অবজেকটিভ ডায়ালেকটিক, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃসারের প্রতি যাত্রা, যদি অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বলে ধারণা হয়। পরিবর্তমান আঙ্গিকগুলির বিচার বাদ দিলে—এই সাধারণ নন্দনশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এখন লিরিক কবিতার স্ট্রেঞ্জনেস বিচারে বলতে হবে কবিতার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি হলো শিল্পকর্মের অংশ হিসাবে শিল্পধর্মীই। কবি বাস্তবতাকে যে-রূপ দিয়েছেন আমাদের চোখের সামনে অনুভবের দাক্ষিণ্যে তা যেন তক্ষুনি প্রস্ফুটিত, উদ্বর্তিত হয়ে উঠল। অবশ্য গদ্য ও নাটকে বিষয়ীগত ডায়ালেকটিকের

দাক্ষিণ্যেই কেবলমাত্র বস্তুগত ঘটনা এবং অন্তঃসার কাব্যিক ভাবে প্রতিফলিত বাস্তবের প্রকাশ করে থাকে। বস্তুগত ডায়ালেকটিক প্রা প্রাচুর্যের সঙ্গে যা Natura Naturata রূপে বিবর্তিত হয়ে ওঠে গদ্যে আর নাটকে, আমাদের চোখের সামনে তাই Natura Naturan হয়ে জন্ম নিল কবিতায়।"

সুতরাং কবিতা ও অন্যবিধ সাহিত্য-আঙ্গিকের তফাৎটা কোথায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিল্পের মনধর্মিতায়—সাবজেকটিভিটিতে—বাস্তব জগতকে কবি যেমন বুঝেছেন তারই উন্মোচন নয়, কবিতা উন্মোচন করে সেই যথার্থ পদ্ধতি, যার তাৎপর্যে কবির মনধর্মিতা বস্তুগত অস্তিত্বের ভেতরে ও বাইরের জগতে প্রবেশ করে। সুতরাং বলা যায়, কবিতাটির মধ্যে বাস্তবতা এবং কবির মনধর্মিতার সম্পর্ক জন্ম নেয় এবং আমাদের চোখের সামনে বিবর্তিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কবিতা শিল্পগত তাৎপর্যে বিধৃত হয়ে ওঠা বাস্তবতাটুকুই মাত্র নয়। উপন্যাসে বা নাটকে ঐ একই বাস্তবতার উন্মোচন ঘটতে পারে এমনভাবে যে ঐ বাস্তবতাই লেখকের সঙ্গে তার সম্পর্কটিকে নিংড়ে নিয়েছে। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে শিল্পীই বাস্তবের ঠিক ততখানি বস্তুগত বাস্তবতা নিংড়ে নেবেন, যতখানি ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য চেতনায় উন্মোচন ঘটানো প্রয়োজন। লুকাচের নিজের কথায় বলতে গেলে 'ঘটনা ও অন্তঃসারের বস্তুগত ডায়ালেকটিক' মনধর্মিতার অন্তঃসারের দিকে প্রবণতা এবং গদ্য ও নাটকে তার ফলাফল আত্মস্থ করে নেয়; কিন্তু কবিতায় এই অবস্থান একেবারে বিপরীত।

লুকাচ উল্লিখিত সম্পর্ক বলতে কী বুঝেছেন? জনৈক কবির কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে লুকাচ এক সময়ে লিখেছিলেন "ঈগো ও বাইরের জগতের সম্পর্কের উপরেই সবশেষে কবিতার আঙ্গিক নির্ভরশীল"। কবির স্টাইল ও বিশ্বদৃষ্টির (weltanschauung) মূল চাবিকাঠি কিন্তু লুকাচের এই উক্তির মধ্যেই নিহিত আছে। উদাহরণ

দেওয়া যাক। কবি হাইনরিশ হাইনের শ্লেষ বা আয়রনি অনুধাবন করতে গিয়ে লুকাচ বলেছেন যে হাইনে সেই সব কল্পসত্য বা ইল্যুসন দ্বারা আবিষ্ট ছিলেন, যেগুলি আবার তিনিই নির্মমভাবে বিচূর্ণ করেছেন। ১৯৪১ সালের অন্য একটি রচনায় লুকাচ বলেছিলেন, "কবির ইগো এবং বাইরের জগতের সম্পর্কটি ঠিক কেমন হতে পারে? কতখানি পরিমাণে, গভীরতায় এবং তীব্রতায় মনজীবনের সঙ্গে সজীবভাবে সম্পর্কিত বাইরের জগত, ইগোর উদ্বর্তন ও প্রকাশের জন্য প্রয়োজন? ঠিক এভাবেই আবেগগত অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির দর্শনের সমস্যাবলীর ধারণা ও সেগুলি জয় করা গ্যেটের সবচেয়ে সাবজেকটিভ, গভীর, ব্যক্তিগত এবং আত্মিক সমস্যাগুলির সঙ্গে যোগ রেখেছে। এমনি ভাবেই হাঙ্গারীয় সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন পেতফির মনোজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। যখনই গ্যেটে বা পেতফি এই সমস্যাগুলিকে নাড়াচাড়া করছেন, তাঁরা তাঁদের গভীরতম ইগোকে ব্যক্ত করছেন, তাঁরা 'স্বীকারোক্তি' দিচ্ছেন, এবং এই স্বীকারোক্তিগুলি কেবলমাত্র 'বাহ্য' ঘটনাবলীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা নয়। সুতরাং কবির স্বীকারোক্তির ধরন যে-বিষয়ে স্বীকাররোক্তি হলো তার কার্যকারিতা এবং স্বীকারোক্তিকারী ইগোর স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপ্তি, আর তার ক্রিয়ার আয়ত্তাধীন সীমা ইত্যাদির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।" অতএব কবিতায় সর্বাধিক বস্তুগত বিষয় সবচেয়ে বেশি মনোগত অভিব্যক্তির আবরণীতে ঢাকা পড়ে গিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।

উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী বলা যেতে পারে কাব্যিক মানসিকতার চারিত্র্য গদ্যলেখক বা নাট্যকারের মধ্যে যেমনভাবে থাকে, তেমনটি ঠিক কবির নয়! উভয় ধরনের ক্রিয়ার বিভিন্নতা রয়েছে। তবু কাব্যিক মানসিকতা হলো 'তৎক্ষণাৎ বোধগম্য এবং ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ সৌন্দর্যানুভূতিগত কাব্যিক ভাবে রূপায়িত শিল্পকর্মের কেন্দ্র'। গদ্য রচনা বা নাটকের মানসিকতা থেকে এর তফাৎ হলো 'শিল্পগত

আঙ্গিকটির নিজেরই জঙ্গম ভূমিকায়, কাব্যিক মানসিকতার নিজস্ব অদ্ভুত অস্তিত্বের ধরনের, ফলে এই মানসিকতার বিস্ময়কর কার্যলীলা ক্রমাগত দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।' এ ধরণের কাব্যক্রিয়া পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই যখন কবির মানসিকতা শিল্পকলা রচনার ফলে পরিবর্তিত, অন্য স্বরূপে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

লুকাচ যে নির্দিষ্টতা বা স্পেসিফিসিটির কথা শিল্পের বিশেষ মানবিক সম্পর্কতার মূল্যে বলেছেন, আমরা এ নিবন্ধের সূত্রপাতে সে কথা বলেছি। লুকাচ ঐ নির্দিষ্টতাকে রসশাস্ত্রের রূপ-পরিগ্রহণের মধ্যমণি বলে মনে করেছেন। এই নির্দিষ্টতা শিল্পের জগতে আদর্শ টাইপ, বা টিপিক্যাল ধারণার মধ্যে সবিশেষ চিহ্নিত।

ঘটনা ও অন্তঃসারের বাস্তব ডায়ালেকটিকের রূপ দিতে নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক টিপিক্যাল চরিত্র ও ঘটনার অন্বেষণ করবেন, ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার চরিত্রগুলির উন্মোচনে নিযুক্ত। তাঁর নিজস্ব নীতি বিষয়ক চিন্তা এক্ষেত্রে মুখ্য নয়—তাঁর চোখে দেখা বাস্তবতার যথার্থ উন্মোচনই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু কবির? কবির একেবারে নিজস্ব অনুভব, মানসিকতা যা কবিতায় রূপ নিচ্ছে তাই টিপিক্যাল! কবির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, নীতি-চিন্তা সবই তাঁর সৃষ্ট কবিতার অংশস্বরূপ। কবির ইগো ও উপন্যাসকার বা নাট্যকারের ইগো তাই সমধর্মী বা এক ধরনের নয়। লুকাচ এজন্যই স্যুররিয়ালিজমকে কবিধর্মের বাইরের বিষয় বলে মনে করেছেন। এই দুধরণের ইগো তফাৎ করতে অক্ষম ঐ কবিদের তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। যদি যেমন তেমন ভাবনার ও সম্পর্কের একই মর্যাদা দেওয়া কবির কাম্য হয়ে পড়ে, তবে ব্যক্তিত্বের মূলধাতুই বিনষ্ট হতে বাধ্য এবং স্যুররিয়ালিস্ট কবিরা নিজেদের কাব্যিক ব্যক্তিত্ব রচনার কাজে নিজেরাই পরিপন্থী হয়েছিলেন। অর্থাৎ কবি-ব্যক্তিত্ব ও স্যুররিয়ালিজম পরস্পর বিরোধী। লুকাচ মনে করেছেন, অনর্গল উদ্দেশ্যহীনতার প্রস্রবণ মানসিক

পরিমণ্ডলেরই অনর্গল উন্মোচন ঘটাতে ঘটাতে এক সময় একধরণের ভেতরের দিকে মুখফেরানো এক বিশেষ কায়দার প্রকৃতিবাদ, বলা যেতে পারে ইনট্রোভার্ট ন্যাচরালিজমের জন্ম দেবে। কবির নিকটে কবিতা হঠাৎ পাওয়া উৎসহীন উচ্ছ্বাস নয়, কবিতাটি রচনা করে তোলার পিছনে কবিব্যক্তিত্ব নিরন্তর সক্রিয়। যে ইগো কবিতার সৃজন ঘটাচ্ছে, কবির সেই ইগো কবির আকস্মিক সৃষ্টিশীল কাব্যিক মেজাজ বা মুডের উপরে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে না, কিংবা কবিতার মতো কিছু একটা রচনা করার ক্ষমতার উপরেও নির্ভর করে না। ভাস্কর যেমন একটি নিরেট পাথর কুঁদে কুঁদে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অংশ ছেঁটে ফেলে প্রস্তর প্রতিমা নির্মাণ করেন, লুকাচের মতে ঠিক তেমনি ভাবে কোনো বড় কবি নিজের কবিব্যক্তিত্বটি, তাঁর নিজের ইগো, নিজেই অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে গড়ে তোলেন। আর সেই ইগোই কবির শক্তিশালী আবেগগত ও মনীষাগত অনুভবের মধ্য দিয়ে কবিতাকে বাহন ক'রে পাঠক-মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। বিষয় নির্বাচন, সঠিক প্রকাশভঙ্গি নিরূপণ ও শিল্পসম্মত রূপদানের তাৎপর্যে ঐ অনুভবগুলি আকস্মিকতার দোষবর্জিত হয়ে ওঠে এবং কবিতার ক্রিয়াধর্মে নির্দিষ্ট-মানের স্তরে উন্নীত হয়।

কবি অ্যাডির-এর উপরে লেখা একটি নিবন্ধে লুকাচ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে "কবির আবেগ কেবল জগতেরই প্রতিফলন ঘটায় না, প্রকাশের এক বিশেষ কায়দাও গড়ে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট, তৎক্ষণাৎ এবং যেন দ্রবীভূত হয়ে মিলিয়ে না যায় তেমনি এক বক্তব্যও কবিতায় সৃষ্টি করে।" কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলি সব সময়েই কবির ব্যক্তিত্বটি সমানভাবে প্রত্যক্ষগোচর করে না; যুগ, কবির বয়স ও অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্যাপার কবির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়; এমন কী কোনো কোনো কবির জীবৎকালেই এই দোলাচল বিপুলভাবে সংঘটিত হতে পারে।

কেননা, কবির নিকটে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ অন্বেষণ করে। অন্য কোনো কবি, কিংবা ঐ একই কবি তাঁর জীবনের অন্য এক পর্বে নিজেকে আবার নির্দিষ্ট বিষয় বা ভাবনার আস্তরনেই ঢেকে রাখতে পারেন। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব তাঁরই স্বাক্ষরিত কবিতার ফল বলে যদি ধরা হয়, তবে এই নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বা আইডিয়া—এমন কী কল্পিত স্ব স্ব স্বাধীন অস্তিত্ব রাখতেও অক্ষম। কেননা তাদের সজীব থাকতে হলে প্রতিনিয়ত নবীনায়ণের ফলেই কবির অন্তর্লোকে ঐ বিষয়-বস্তু ও আইডিয়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে। কোনো কবির কবিতা তাই সজীব অনুভবের অনুপস্থিতিতে যেমন নীরস হয়ে ওঠে, নাড়া দেয়না, তেমনি কোনো এক বিশেষ সময়ে একই ধরণের কাব্যবস্তু ও ভাবনা যদি ঘুরে ফিরে, অথচ সজীব অভিজ্ঞতার দাক্ষিণ্যে উন্মোচিত না হয়ে আসে, তাহলে কবিতার চক্রাবর্তন এবং অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কাব্য বিচারে রাজনৈতিক কবিতার স্থান কোথায়? এদেশে বা ওদেশে সম্প্রতি শোনা যায়—কবির কোনো মতবাদ নেই, কমিটমেণ্টও নেই। একদিকে রাজনীতিকদের দাবি, রাজনৈতিক দলের সর্বশেষ সার্কুলারটি কবিকে যেন কবিতায় রূপান্তরিত করতে হবে! অন্যদিকে অন্য একধরনের ব্যক্তিদের বক্তব্য, কবিকে কোনো মতবাদাশ্রিত হলে চলবে না। কবিতাকে একদল শ্লোগান, অন্যদল শ্লোগানবিরোধী রূপে দেখতে চান। লুকাচ নিজে অত্যন্ত বিখ্যাত মার্কসবাদী। তাঁর মতামত এ বিষয়ে কি? ১৯৪৫ সালে রাজনৈতিক কবিতা বিষয়ক এক বক্তৃতায় লুকাচ বলেছিলেন "দৈনন্দিন ঘটনায় যে শিল্প-আঙ্গিকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ভূমিকা আছে, তা হলো কবিতা। একথা আজও যেমন, ভবিষ্যতেও তেমনি সত্য থাকবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে সচেতন কবির নিকটে দুটি বিষয় একই সময়ে সত্য: তাৎক্ষণিক কার্যকারিতায় চিরায়ত সত্যের প্রকাশ আবার এই চিরায়ত সত্যের প্রকাশের সঙ্গে সেই

তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার সংযুক্তি কিংবা বলা যেতে পারে ঐ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ঐ চিরায়ত বিষয়েরই অন্যতম ফলস্বরূপ। তাহলে আসল ব্যাপার হলো যে যথার্থ রাজনৈতিক কবি, পার্টিজান কবি, প্রায় সব সময়েই শতকের বড় বড় প্রশ্নগুলিকে ভাষা দেন, যখন তিনি তাৎক্ষণিকতার সঙ্গে যুক্ত এমনকি তখনও তিনি ঐ বড় প্রশ্নগুলিকেই রূপ দিচ্ছেন।"

লুকাচ 'নন্দনশাস্ত্রের নির্দিষ্ট স্বরূপ' নিবন্ধে শিল্পের অ্যানথ্রোপমরফিক স্বরূপের জন্য পার্টিজানশিপকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। যেহেতু নন্দনশাস্ত্র একমাত্র মানুষের সঙ্গেই সম্পর্কিত এবং শিল্পের উদ্বোধনী প্রভাব আবেগের সৃজন ঘটায়, ফলে শিল্পরসগ্রাহী ঐ ব্যক্তি শিল্পের আস্বাদে স্পষ্টতই প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। এই প্রভাবের কথা যদি মনে রাখতে হয়, তবে আবেগের কথাটি তো পূর্বেই ধরে নেওয়া হয়ে যায়। আবেগ যখন নিরপেক্ষ হতে পারে না, সুতরাং শিল্পের আস্বাদজাত প্রভাবটির ক্রিয়াও নিরপেক্ষ নয়। এই বিশ্বজনীন পার্টিজানশিপের সঙ্গে তো সব শিল্পকর্ম, বিশেষভাবে সকল কবিতাই যুক্ত। তবে এই বিশ্বজনীন পার্টিজানশিপ থেকে অন্য এক ধরনের পার্টিজানশিপ লুকাচ আলাদা করেছেন। সেই দ্বিতীয় পার্টিজানশিপের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন যেমন লেসিং বা শেলী, হাইনে বা পেতেফি, গর্কী, কিংবা গর্কীর মতো যাঁরা ঘটনাপুঞ্জকে প্রত্যক্ষ ভাবে রূপায়ণে অংশ নিতে চান।

লুকাচ পার্টিজান কবি বলতে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা বামপন্থীর কথা বলতে চাইছেন না। তাঁর মতে "যখন বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল, একের পর এক তখন বড় বড় পার্টিজান কবির উদ্ভব ঘটেছিল। যে সমস্ত দেশে অস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক দল রূপ নিচ্ছিল কিংবা হয়তো রাজনৈতিক দলের নিছক অস্তিত্বই ছিল না—সে সব দেশেও তাঁরা জন্ম নিয়েছেন।"

যদি সত্যই কবির ইগো কবিতার মূল চরিত্র হয় তবে উদ্বোধনী বা ইভোকেটিভ প্রভাব, কবির বক্তব্যের পক্ষেই করা সম্ভব যা কবির গভীর ভাবে আত্মস্থ হয়ে আছে এবং কবির নিকটে কবিচারিত্র্য ও কবিব্যক্তিত্ব অনুসারে যা তাঁর আভ্যন্তরীণ, ভেতরের ব্যাপারও! রাজনৈতিক কবি লুকাচের ভাষায় যেন গেরিলা যোদ্ধা, রাজনৈতিক দলের মূল রণকৌশল সম্পর্কে যিনি অবহিত, কিন্তু নিজের অস্ত্র প্রয়োগের বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাঁর একেবারে নিজের।

লুকাচ যেমন রাজনৈতিক কবিরও স্বাধীনতা দাবি করেছেন রাজ-নৈতিক নেতৃত্বের দৈনন্দিন আবেদনের বাইরে, তেমনি মনে করেছেন যে রাজনৈতিক কবি হবেন অন্যান্য বিশ্বজনীন পার্টিজান শিল্পের কবিদের থেকে ঢের বেশি সচেতন। এই সচেতনতাই কবির ভবিষ্যকথন বা প্রফেসির উদগাতা। লুকাচ যেমন একদিকে শিল্পকে বিজ্ঞান ও দর্শনের চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে ইউটোপিয়া-বিরোধী বলে মনে করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দাবি করেছেন 'ভবিষ্যকথন ব্যতীত যথার্থ কবির মহত্ত্ব অনুধাবন করা সাধ্যাতীত'। মনে রাখতে হবে, কালের মূল সত্যের সঙ্গে রয়েছে কবির গভীর নিহিত যোগাযোগ, তাঁর অন্তর্লোকে ঘটনাপুঞ্জের নির্যাস এমন এক সম্ভাবনাময় নক্সার সৃজন ঘটাবে যার ফলে ভবিষ্যকথন বা প্রফেসি তাঁর পক্ষেই সম্ভবপর হয়ে উঠবে। এজন্য কবির আয়ত্তে রয়েছে বিশ্বজনীনতাও বটে। কবির নিজস্ব কালের বিপুল পরস্পর স্ববিরোধিতা, বৈপরীত্য, সব কিছুরই গভীরে লিরিক্যাল সত্যতার সঙ্গে কবি প্রবেশ করেন। লিরিক্যাল সত্য হলো 'কোনো মুহূর্তের' সআবেগ অভিজ্ঞতা। কোনো একজন কবির কোনো একটি কবিতায় বিশ্বজনীনতা ফুটে না উঠতেও পারে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ের ঘটনাপুঞ্জের কাব্যরূপায়ণ নিখিল সর্বজনীনতার দিকে কবির উন্মোচন ঘটায়। কোনো একটি কবিতাই তো আর পূর্ণতা-বিধৃত নয়। কিন্তু বিশ্বজনীনতার ধারণা গভীর ধী-শক্তি ব্যতীত কবির পক্ষে আয়ত্ত করা কি একেবারেই সম্ভব!

মার্কি দ্য সাদ ও তাঁর উত্তরপুরুষ

১৮০৬ সালে মার্কি দ্য সাদ তাঁর উইলে এক জায়গায় উল্লেখ করেছিলেন যে, তাঁর 'স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে যাবে' একসময়। তবু ইউরোপীয় গবেষকদের ক্লান্তি নেই। যদিও পুলিশ ও তাঁর পুত্রের তৎপরতা তাঁর অধিকাংশ রচনাই নষ্ট করে দিতে যত্নপর ছিল, তা সত্ত্বেও মার্কি দ্য সাদের জীবনকাহিনীর সূত্র ও নানাবিধ উপকরণ, এমনকী বহু প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনাবলী নানা জায়গা থেকে পাওয়া গেছে।

সাদের জীবন ও রচনা অনুশীলন করে বহু মনঃসমীক্ষক রায় দিয়েছেন যে, সাদ যদি সার্থক, এমন কী মোটামুটি ধরনের নাট্যকারও হতে পারতেন, তবে পরপীড়ন ও আত্মনির্যাতনের বিকৃতি তাঁকে সইতে হতো না। অথবা তাহলে পরম সত্যের মতো সাদ প্রচার করতেন না যে যন্ত্রণা দিয়ে মানুষের মধ্যে যতটা পরিবর্তন আনা যায়, আনন্দ দিয়ে ততটা কিছুতেই সম্ভব নয়। ফ্রয়েডীয় বিচারে অবশ্য প্রতিটি শিল্পীই যৌনতাকে অবদমন ক'রে, তার ঊর্ধ্বে উঠে শিল্পরচনা করেন। সাদের যৌনতা ঘটিত নানা ব্যভিচার, এবং রচনায় তার অতি প্রতিফলন, সহজেই ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তটি মনে পরিয়ে দেয়। বুঝি, সাদ যতটা ঊর্ধ্বে উঠলে শিল্পী হতে পারতেন, ততঠা ওঠবার তাঁর সামর্থ ছিল না। ফলে, আত্মনিগ্রহও এমন বিলাসীস্তরে পৌঁছেছিল যে, স্ত্রীকে লীলাচ্ছলে সাদ লিখেছিলেন, শ্রীমতী সাদ যেন তুটি মাথার খুলি যোগাড় করে পুলিন্দায় ভরে তাঁকে পার্শেলে পাঠান। লিখেছিলেন, 'আমি আগ্রহের সঙ্গে তোমার পুলিন্দাটি খুলে ভেতরে কি রয়েছে দেখতে চাইব। কিন্তু খুলেই ভীষণ ভয় পেয়ে যাব!' এমন কি সাদ একবার

তাঁর একটি ঘরে মানুষের হাড়গোড় দিয়ে সাজিয়েছিলেন। অথচ তিনি ঐ গৃহসজ্জায় হাস্যকর দিকটি সম্পর্কেও পুরোপুরি অবহিত ছিলেন।

মনঃসমীক্ষকগণ সাদের জীবন ও রচনাবলী অনুধাবন করে রায় দিয়েছেন যে, হিটলার যদি স্বনামধন্য স্থপতি হতে পারতেন, অথবা যদি মুসোলিনী প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার হতেন, তবে পৃথিবীতে এই শতকের বর্তমান ইতিহাসের রূপরেখাটি বোধহয় অন্য রকম হতো। কথাটি ঘুরিয়ে বোধহয় এমনভাবে বলা যায় যে অপরিশীলিত আবেগসাপেক্ষ অপূর্ণ প্রতিভাধর ব্যক্তি যখন রসগ্রাহী সাধারণ্যে প্রশ্রয় পায় না, তখন ব্যক্তিত্বের পশ্চাৎপটে এক জেদী ব্যক্তি ক্রমশ রূপপরিগ্রহ করে—যার তৃপ্তি আসে শিল্পরচনা থেকে নয়, আসে আত্মপীড়ন ও পরপীড়নের মধ্যদিয়ে।

মার্কি দ্য সাদের জীবনকাহিনীটি সাম্প্রতিক আমাদের দেশে কোনো কোনো তরুণ কবির ভূমিকা প্রসঙ্গে আমার স্মরণে এলো।

এ কথা বললে কি খুবই ভুল বলা হবে যে আমাদের দেশে তরুণ সংস্কৃতিসেবীব্যক্তি অতিমাত্রায় জনপ্রিয়তার নিরিখে উৎরে যাবার জন্যে জনবিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন? যদি স্থূলরুচি-পাঠকদের প্রশ্রয় পাওয়া গেলতো অর্থে ও খ্যাতিতে সহজে সম্ভ্রান্ত হবার পথটি অর্গল-মুক্ত হলো। যদি সহজ পাঠকসমর্থন না ভাগ্যে জোটে তবে তার প্রতিক্রিয়ায় শিল্পচর্চা এমন রূপ নেয়, যার উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে নির্বিশেষ বিকৃতি, এবং আত্ম ও পরপীড়ন। এ-প্রসঙ্গে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শব্দটি অতিব্যবহারে জীর্ণপ্রায় হতে দেখি। এঁরা অবশ্য অনেকে নিজেদের অস্তিবাদী বলতে ভালোবাসেন। কিন্তু এঁরা কেউ অবশ্য অস্তিবাদীর মতোও কোনও মুক্তির কথা বলেন না; বরং সামগ্রিক নেতির উপরেই এঁদের সাহিত্য ও শিল্পের প্রস্তাবনা। প্রসঙ্গত এঁরা এমন অপ্রভাবিত কোনো secular সত্তাকে বিশ্বাস করেন যে, কোনো কিছুতেই আস্থা রাখাটাই স্বঘোষণায় অন্তত এঁদের কাছে সীমাবদ্ধতা হয়ে দাঁড়ায়। আস্থা এবং এমন কী আস্থার প্রতি অনাস্থার আস্থাও এঁদের শিল্পে অভিপ্রেত নয়। প্যাস্কাল যেমন নিরীশ্বর চিন্তায়

কবল্যের বিষয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মানুষ ঈশ্বরের অসীম মহিমা অনুধাবন করতে পারে বটে, কিন্তু সে নিজে' শরীরধারী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতা মাত্র। সুতরাং ঈশ্বরহীন ব্যক্তির নিকটে আপন অস্তিত্বই ঈশ্বরের পরিপূরক, ফলে স্বর্গ ও নরক, যার যেমন অভিরুচি ঠিক তেমনি চিন্তাতেই পৃথিবীকে রূপ দিতে চায়। প্যাস্কালের উক্তিগুলিকে যথার্থ তাৎপর্যে না দেখে, বুদ্ধিবাদীর যন্ত্রণায় না পৌঁছেই অনেকে এঁরা একে আপ্ত বাক্য বলে ধরে নিয়েছেন।

কোনও বিশ্বাসগত পক্ষপাত না রইলে শিল্পীর সাধারণত দুটি দিক খোলা থাকে—হয় অতি ভদ্র হয়ে যাওয়া, নইলে ভদ্রতা প্রভৃতি অতি মসৃণ বিষয়বস্তুগুলির বিরুদ্ধাচরণ করা! প্রথম দল এস্টাব্লিশমেণ্টের সূত্রে নির্দ্বিধ সাহিত্যকর্মে আগ্রহী, দ্বিতীয় দলের সংঘর্ষ আপাত দৃষ্টিতে এস্টাব্লিশমেণ্টের সঙ্গেই। তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে বিলেতে এখন স্পেন-যুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক বাহিনীগঠনের প্রয়োজন হবে না, এমন কি স্বয়ং অডেন সাহেবও তাঁর পুরনো রাজনৈতিক কবিতাগুলি ঘষে মেজে কাব্যগ্রন্থের নতুন সংস্করণ বের করেছেন। সে-দেশের যাঁরা চলতি রুচির অতি তরুণ রূপকার, যে রুচি ইতিমধ্যে এস্টাব্লিশমেণ্টের কর্ণধারগণ মান হিসাবে স্থির করে নিয়েছেন—তাঁরা জেনে গেছেন কোন পদ্ধতিতে চললে পত্রপত্রিকা-নিয়ন্ত্রিত রুচির জনস্বীকৃতি দ্রুত পাওয়া যায়।

নতুন ইংরেজ কবিদের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে এ. অ্যালভারেজ যেন একটু উষ্মা নিয়েই ওঁদের 'অতি ভদ্রলোক' বলেছেন। ষ্টিফেন স্পেণ্ডার এতে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমরা অবশ্য অ্যালভারেজ-এর কথা ধ্রুব বলে মেনে নিই নি, তবু ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের তরুণ কবিদের সমর্থনে এই দাদাসুলভ আচরণ কম কৌতুক সৃষ্টি করে নি। স্টিফেন স্পেণ্ডার অবশ্যই এখন এসটাব্লিশমেণ্টের প্রধান কীর্তনিয়া। সুতরাং যদি কেউ এসটাব্লিশমেণ্টের মূল ধরেই টান দেন তো, মূল গায়েনের চটবার কারণ যথেষ্ট রয়েছে। অ্যালভারেজ কেবলমাত্র বলেছেন,

সেরা আধুনিকদের প্রতিক্রিয়ায় ত্রিশের ইংরেজ কবিগণ কঠিন কবিতার পরীক্ষা নিয়ে আর ব্যগ্র হলেন না, বরং রাজনৈতিক রণধ্বনিই একমাত্র মুখ্য জ্ঞান করা হলো। চল্লিশের দশকে প্রতিক্রিয়ায় ডিলান টমাস প্রভৃতির মস্তিস্ক-চর্চার বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পঞ্চাশের চল্লিশেরই প্রতিক্রিয়া "against wild, loose, emotion"—অ্যালভারেজ-এর মতে এঁরা সবাই বিভিন্ন দশকের 'negative feed-back' মাত্র। ওয়েলফেয়ার স্টেটের দাক্ষিণ্যে রাগী ছোকরাদের ক্রোধও যে সমাজের উপর তলায় উঠবার সিঁড়িটি অন্ধকারে খুঁজে না পাবার ক্রোধ, এবং পাওয়া না পাওয়ায় মধ্যে তরুণ কবির জগতে—'the concept of gentility still reigns supreme. And gentility is a belief that life is always more or less orderly, more or less in order, people always more or less polite, their emotions and habits more or less decent, more or less controllable : that God, in short, is more or less good." এক কথায় সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে। ব্যবস্থার প্রতি আত্মসমর্পণ কবিকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি দেয়না বটে, কিন্তু এসটাব্লিশমেণ্ট তাঁকে মেনে নেয়—কেননা এঁরা আর যাই হোন এসটা-ব্লিশমেণ্টের বিরুদ্ধে তো নন! বরং সমর্পিত। ফলে এই ভদ্রলোক কবিকুলের নিকটে আমরা কেবল আত্মহননেই পরিত্রাণের সূত্র পেতে পারি, কোনও আঙ্গিক, কাব্য-বিদ্রোহ এঁদের নিকটে প্রত্যাশিত নয়। ফলে অদ্যাবধি এলিঅট, পাউণ্ড এমন কি ওয়ালেস স্টিভেন্স, অডেন প্রভৃতির কথাই মনে পড়ে।

১৯৩০-এর সময় পর্যন্ত বঙ্গদেশে রুচির বিদ্রোহ বহুলাংশে অর্থকরী ছিল না। অথচ বর্তমানে যথার্থ উন্নত রুচি প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হলে বৃহৎ সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকার মুনাফাতেই ধরবে ভাঙন। যেখানে লেখক কেবলমাত্র পত্রিকা ও প্রকাশকের মুনাফা অর্জন করবার পথে

শ্রমিকবিশেষ, সেজন্য যে শ্রমিক বেশি মুনাফা দেবেন, তাঁর স্বীকৃতি পত্রিকা ও প্রকাশক মহলে অনেক বেশি। মনোপলির নিয়ন্ত্রিত বাজারে যেমন নতুন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নজর কম থাকে, এখানেও তেমনি। মাঝে মাঝে মতামতের পৃষ্ঠা করে তাঁরা গ্যালাপ পোলের মতো ব্যবস্থা করে নীতি নির্ধারণ করেন। যতদিন পাঠক সমাজ উন্নত সাহিত্য-নীতিতে কম আগ্রহী থাকবে, ততদিনই একচেটিয়া সাহিত্য পত্রিকা ও প্রকাশক-গোষ্ঠির মুনাফার হার নিশ্চিতই থাকবে। তাই প্রশ্নহীন, নির্দ্বিধ উক্তি-প্রত্যুক্তিই বর্তমানে এসটাব্লিশড সাহিত্যমান। ক্ষুধার ওপরে রাজনীতির ভিত্তি, যৌনতায় ভিত্তি সাহিত্যের—এরকম একটা মনোভাব পরোক্ষ প্রশ্রয় পাচ্ছে।

বৃহৎ সংগঠনের ভূমিকা যে মনীষাচর্চায় মুক্তি আনে না—তা আমরা উল্লেখ করেছি। আমাদের কালে ইংলণ্ড-আমেরিকার তরুণ-তরুণীরা অনেক বেশি স্বস্তিসন্ধানী। ফলে জুনিয়ার এক্সিকিউটিভ, টেকনিসিয়ান হবার আকাঙ্ক্ষা যুবমনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মানুষ অনেক বেশি হিসেবী হয়ে পড়েছে। এই অতি ক্যালকুলেটিভ যুবক যখন শিল্পক্ষেত্রে শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন সে উত্তরণের সিঁড়িগুলির কথা সব সময় মনে রাখে। পথ খোঁজে, তবে বে-রাস্তায় ড্রেন পাইপ ধরে ওঠাটা মন্দ পথ নয়। যাঁরা সোজা উঠবার পথ পান না, তাঁরা নানাবিধ ভঙ্গি, কনসিট প্রভৃতির দ্বারা অন্যান্য প্রতিযোগীদের আঘাত দিয়ে নিজেরা তফাৎ হবার চেষ্টা ক'রে, বোঝাতে চান—তাঁরা নতুন মানের রচয়িতা। এসটাব্লিশমেণ্টের অস্বীকৃতি তাঁদের এত পীড়িত করে যে নানা অদ্ভুত ভূমিকা বড় পত্র-পত্রিকায় তাঁরা নিতে ভালবাসেন। খুদে পত্রিকাগুলিতে প্রদর্শনবাতিকতারই প্রাদুর্ভাব। কে কতটা শকিং রচনা প্রকাশ করতে পারেন—সেখানেই যেন প্রতিযোগিতা। জাতে উঠবার জন্য ক্ষুদে পত্রিকাগুলি কনভেয়ার বেল্ট বিশেষ, তাঁরা যতই শাস্ত্রবিরোধী লেখক বলে নিজেদের দাবি করুণ না কেন। যতদিন শিল্প-সৃষ্টিতে খণ্ডিত প্রতিভার মূল্য না মিলছে ততদিনই এঁরা

বিদ্রোহী। যখনই কোনো সাহিত্য ব্যবসায়ী তাঁকে সামান্য জনপ্রিয়ত্ব কোল দিল, সব অভিমান ঘুচে গেল। আসলে বড় লেখক চান সংগ্রাম। নিজেই নিজের রুচি ও মান নিয়ামক। ক্ষুদে অভিমানী আপাত হাঁকদাকের পর নিরূপিত রুচি ও মানের ভজনাতেই সফল সাহিত্যিক হতে পারেন। 'শক' দেবার ব্যাপারটা সাদীয়। এসটাব্লিশমেণ্টে জাতে ওঠার পথে অগ্রসর হওয়া আসলে গড়ে তোলে শেষে নিগেটিভ ফিড ব্যাক মাত্র।

আসলে চতুর্দিকেই এস্টাবিশমেণ্টে আশ্রয় পাবার আকুতি। কিন্তু খুব বেশি সব সময় সহায়তা না পাওয়ায়, ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে এঁদের সকলেরই জেদী ব্যক্তিটিকে ক্রুদ্ধ হতে দেখি। ফলত একদিকে যেমন আত্মনিগ্রহী—অপরদিকে তেমনি পাঠককে 'শক' দেবার প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য হবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এঁরা একই সময়ে আত্মনিগ্রহী অপর দিকে পরপীড়ক। সেই অর্থে স্যাডিষ্ট, মার্কি দ্য সাদের আধুনিক উত্তর পুরুষ।

তবু কি নিয়মের ব্যতিক্রম নেই? আছে। প্রদর্শনবাতিকগ্রস্থ লেখকের মধ্যেও মহৎ লেখকের গুণ কচিৎ চমক দেয়। সেই মুহূর্তে বুঝি এখনও মনীষার মাঠ অনাবাদী, আবাদ করলে সোনা ফলত। কিন্তু মূলধনাশ্রয়ী পত্রিকা যখন রুচি নিয়ন্ত্রণে ব্রতী—সেই সর্বগ্রাসী সাহিত্যের একচেটিয়া বেনিয়া একনায়কতন্ত্রে সাহিত্যের স্বাধীনতা আপ্ত বাক্যমাত্র। জীবনবাদী রুচি রচনার কাজে এস্টাব্লিশমেণ্ট ভেঙে নতুন সৎ সৃষ্টির প্রবণতা গড়ে তোলা মানবমুক্তির আন্তর্জাতিক সংগ্রামেরই অংশ।